ব্রতী

জুলাই, ২০২৫

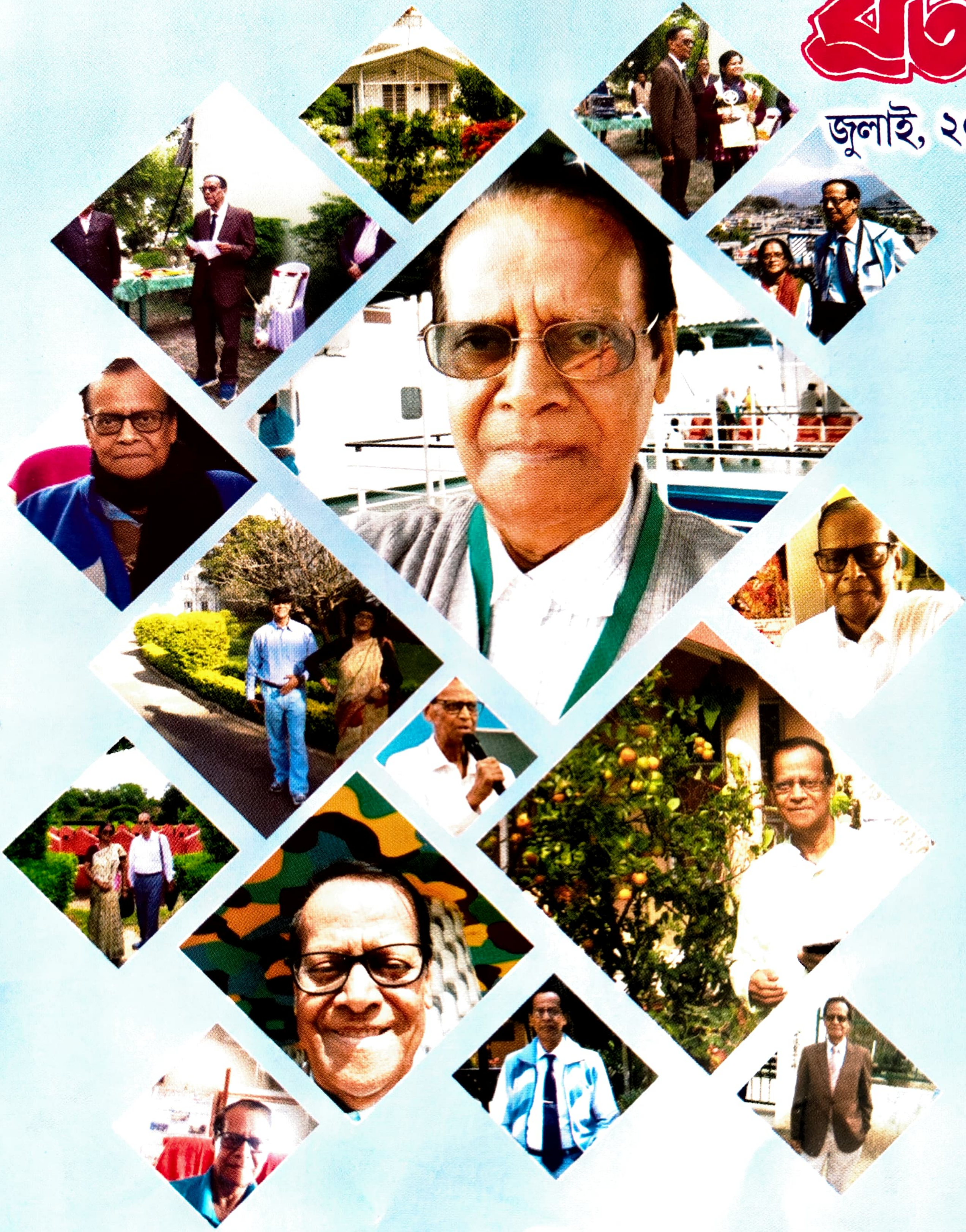

নরেশ চন্দ্র কংসবনিক স্মরণ সংখ্যা

বেদীভবন রবিতীর্থ বিদ্যালয় (উঃ মাঃ)

বেদীভবন • কল্যাণী • নদিয়া।

BEDIBHAWAN RABITIRTHA VIDYALAYA (H.S.)

BEDIBHAWAN, KALYANI,
NADIA, 741250

CONGRATULATIONS

TO ALL OF CLASS X (2024-25)

FOR COMMENDABLE PERFORMANCE IN MADHYAMIK EXAMINATION- 2025 OF WEST BENGAL

Total Candidate (Enrolled)	176
Total Candidate (Appeared)	176
Plucked	NIL
Passed	176
Passed (%)	100%
Highest Marks Obtained	669

Above 90% + Marks	17
Above 80% + Marks	55
Above 60% + Marks	122
Above 45% + Marks	162
Above 35% + Marks	174
Above 25% + Marks	176

SAHNIK SINGHA ROY
669

ARITRA MUKHERJEE
666

GANESH BISWAS
665

SUBHRADEEP HOWLADER
661

AKASH DEY
658

UTTSAB DE
655

SOUVIK SEAL
653

KINGSUK DAS
652

ANURUP CHOWDHURY
648

SRIPARNA MITRA
647

Heartiest Congratulation to all the Students & the Teachers for the excellent achievements

নরেশ চন্দ্র কংসবনিক
জন্ম ঃ ১৮ই এপ্রিল, ১৯৪০
মৃত্যু ঃ ১৮ই জানুয়ারী, ২০২৫

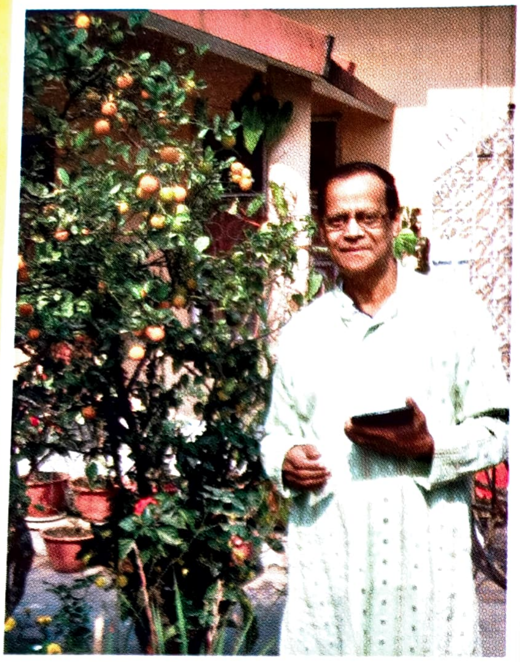

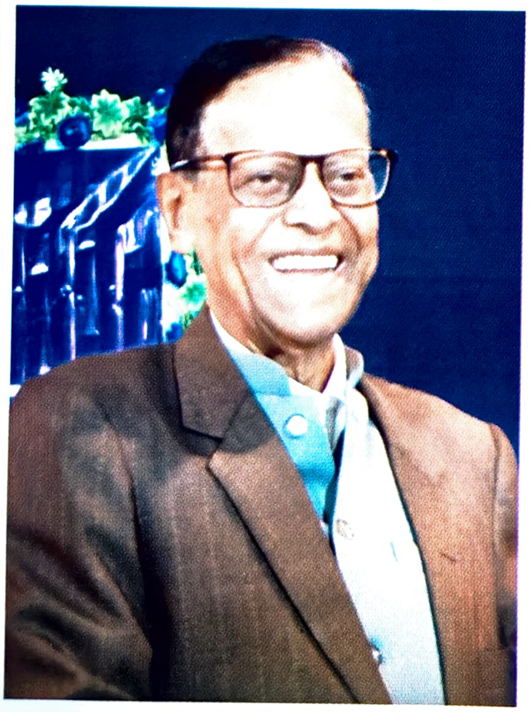

ব্রতী

বেদীভবন রবিতীর্থ বিদ্যালয় (উঃ মাঃ)

শ্রাবণ, ১৪৩২ ❖ জুলাই ২০২৫

সম্পাদকীয়

দর্পণ : ডাঃ শ্যামল চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

নরেশচন্দ্র কংসবনিক স্মরণে
শ্রী মধুসূদন চক্রবর্তী,
শ্রী দুলাল দে,
শ্রী সুনীল সাহা,
ডঃ কিংশুক চক্রবর্তী,
শ্রী বাসুদেব দাম,
শ্রী আশুতোষ কংসবনিক
শ্রী রাজর্ষি কংসবনিক,
শ্রীমতী মানিনী দাস কংসবনিক
শ্রী নীলসায়র দাস

সাক্ষাৎকার : বিদ্যালয়ের প্রাক্তনী ডঃ শান্তনু মজুমদার (অধ্যাপক ও গবেষক, ইউ.কে.)

বিচিত্রা : তৃতীয় শ্রেণি থেকে দশম শ্রেণি ও কোমল শাখার শিক্ষার্থীবৃন্দ (শ্রেণিকক্ষেই চলে নিয়মিত সাহিত্য সাধনা। তার থেকেই সেরা লেখাগুলি স্থান পেয়েছে।)

মেধা প্রদর্শন ২০২৪ এর সেরা প্রবন্ধ এবং বিতর্ক

ঘটমান ঃ শিক্ষার্থী তৃষ্ণা মজুমদার (দশম শ্রেণি)

অনুবাদ গল্প ঃ সৃজিতা ও দেবাদৃতা (ষষ্ঠ শ্রেণি)
(২০২৪ শিক্ষাবর্ষ)

কবিতা ঃ শ্রী সুনীল সাহা

মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষার ফলাফল

অলংকরণ-শ্রী কৃশানু দে এবং
শিক্ষার্থী বিদীপ্তা দাস

প্রচ্ছদ : শ্রী কৌশিক চৌধুরী

পত্রিকা উপসমিতি ঃ দীপঙ্কর ব্যানার্জী (আহ্বায়ক), সৌরভ সাহা, শ্রীময়ী ঘোষ, সন্দীপ মিত্র, তনয়া বাগচী, কৃশানু দে, শ্রেয়সী দে।

সম্পাদকীয়

গত ৯ই ফেব্রুয়ারী ২০২৫ গয়েশপুর পৌর অঞ্চলে এক নক্ষত্র পতন। ধীরে ধীরে সেরে উঠছিলেন তিনি। কিন্তু হঠাৎ......। 'কালীদহে কখন যে ঝড় কমলের নাল ভাঙে'.....কে বা জানে? ....'যে ইঙ্গিতে নক্ষত্রও ঝরে, আকাশের নীলাভ নরম বুক ছেড়ে দিয়ে হিমের ভিতরে ডুবে যায়', সেই ইঙ্গিতেই আমাদের সবাইকে স্তম্ভিত করে বিদায় জানালেন তিনি-- এতদ্‌অঞ্চলের সর্বজন শ্রদ্ধেয় শিক্ষক নরেশ চন্দ্র কংসবনিক। এই অঞ্চলের সংস্কৃতিপ্রেমী, বিজ্ঞানমনস্ক, প্রকৃতিপ্রেমী প্রগতিশীল মানুষই নন, আপামর জনসাধারণ তাঁর শেষ যাত্রায় আঁখিজলে শ্রদ্ধাবনত হয়ে তাঁকে বিদায় জানিয়েছেন। আমাদের প্রিয় প্রতিষ্ঠান বেদীভবন রবিতীর্থ বিদ্যালয় তাঁর বিদায়ে অভিভাবকহীন হলাম। তিনি আমাদের বনস্পতির ছায়া দিয়েছেন। যে স্নিগ্ধ সুশীতল ছায়াতলে আমরা কঠোর-কঠিন বিপদেও আরো বেঁধে বেঁধে থেকেছি-তাঁর সুপরামর্শে, তাঁরই অভিভাবকত্বে, সর্বোপরি তাঁর অভয়দানে। এমন অনন্য ব্যক্তিত্ব সম্পন্ন, নিরহংকার স্বচ্ছ ও সরল চিন্তাধারার মানুষ এই সমাজে খুব কমই আবির্ভূত হন। এমন ব্যক্তিত্বের অধিকারী ছিলেন তিনি, যাঁর সামনে দাঁড়ালে আপনা হতেই নম্র হতে হয়, বাক্‌সংযমী হতে হয়, নিষ্কলুষ হবার মন্ত্রণা পাওয়া যায়। স্বচ্ছ এবং পরিপূর্ণতার এক অনন্য নজির তিনি, যাঁকে অনুসরণ করে এক সরল অথচ সুখী, আড়ম্বরহীন জীবনের হদিশ মেলে।

'ব্রতী' সাহিত্য পত্রিকার প্রতিটি সংখ্যার মুদ্রণের কাজ শুরু হত তাঁরই লেখা ভ্রমণ কাহিনি দিয়ে। 'ব্রতী'-র সংখ্যা তাঁর হাতে তুলে দেবার সময় এক অপার আনন্দ অনুভব করতাম। সর্বদা প্রশংসাসূচক বাক্যে তিনি উৎসাহিত করতেন, কখনও নেতিবাচক বাক্যে কোনো কর্মোদ্যোগীকে নিরুৎসাহিত করতেন না। 'ব্রতী'-র এই সংখ্যায় তাঁকে স্মরণ করে বিচিত্রার পাতা ভরে উঠেছে শিক্ষার্থীদের ভ্রমণ ও প্রকৃতিপ্রেম বিষয়ে নানা স্বাদের লেখনীর দ্বারা। কারণ আপনজনেরা জানে, তাঁর মনন জগৎ জুড়ে ছিল ভ্রমণ ও প্রকৃতি প্রেম।

বিদ্যালয়ের সুবর্ণজয়ন্তী বর্ষ উদযাপনে তিনি সকলের সঙ্গে পা মেলাবেন--বড় সাধ ছিল তাঁর-বারেবারে ঘনিষ্ঠ মহলে তিনি সে কথা বলতেন--সেই সাধ অপূর্ণ রয়ে গেল। আমরা রয়েছি, তাঁর অনুগামীরা, ভালোবাসার জন। আমরা সেই উদযাপন সার্থক করে তুলব। সেটি হবে তাঁর প্রতি আমাদের যথার্থ শ্রদ্ধাজ্ঞাপন।

'ব্রতী' সাহিত্য পত্রিকার পক্ষ থেকে মানবপ্রেমিক নরেশ চন্দ্র কংসবনিক মহাশয়কে আনত শ্রদ্ধা জানাই। 'ব্রতী'র-এই সংখ্যাটি তাঁর স্মৃতিতে উৎসর্গ করা হল।

ডাঃ শ্যামল চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

বেদীভবন রবিতীর্থ বিদ্যালয়ের (উঃ মাঃ) শারদ প্রকাশ অক্টোবর ২০২৪ ব্রতী পাঠ করার সুযোগ পেলাম। আজ পর্যন্ত বহু উচ্চ বিদ্যালয়ের ও মহা বিদ্যালয়ের সাথে যুক্ত থাকার সুবাদে সেই সব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রকাশিত পত্রিকাগুলি পাঠ করার সুযোগ হয়েছে। যতদূর মনে পড়ে এসবের মাঝে ব্রতী অনুপম।

প্রচ্ছদ থেকে সম্পাদকীয়, সাক্ষাৎকার, বিচিত্রা, কোমল শাখা, অনুবাদ গল্প, শিক্ষা ভাবনা, মাননীয় অধ্যক্ষ মধুসূদন চক্রবর্তীর লেখা 'সন্তানের জন্য অভিভাবকের ভাবনা' পাঠ করে সমৃদ্ধ হলাম। এই প্রকার স্বল্প পরিসরে এত সমৃদ্ধ পত্রিকা আমার জীবনে এই প্রথম। স্বপ্ন দেখি বেদীভবন রবিতীর্থের ব্রতীর আদর্শে কবে দেশের অন্যান্য উচ্চ বিদ্যালয়গুলি প্রাণিত হয়ে দেশকে সমৃদ্ধ করবে।

বেদীভবন রবিতীর্থ বিদ্যালয় (উঃ মাঃ),
বিবেকানন্দ সংগঠন
ও
ডাঃ শ্যামল চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ফাউন্ডেশন
পরিচালিত

Vivekananda Sports Academy

অ্যাথলেটিক, ফুটবল, যোগা ও দাবার প্রশিক্ষণ শুরু হয়েছে।

ভর্তির জন্য ফোন করুন: ৮৯১০০২৫২৬৩

মাস্টারমশাইয়ের স্মৃতি

মধুসূদন চক্রবর্তী, অধ্যক্ষ

আমার চেনা মাস্টারমশাই নরেশচন্দ্র কংসবণিক স্মৃতি জুড়ে যেখানে পটচিত্রের মতো স্থান করে আছেন, তার অভিব্যক্তিতে রয়েছে এক অমলিন সৌন্দর্য্য; যেন এক নিকানো উঠোন, যেন সযত্ন স্পর্শে সুরক্ষিত তাঁর পুষ্পশোভিত উদ্যানের মতোই।

তাঁকে প্রথম চেনা পাঁচ দশককাল আগে; এক সন্ধ্যায়। চাঁদমারি দেশপ্রিয় শিক্ষায়তন, যে স্কুল থেকে সদ্য পেরিয়েছি স্কুলশিক্ষার গণ্ডী, সেই স্কুলেরই কবি-স্মরণ অনুষ্ঠান। বক্তা হিসেবে আমন্ত্রিত তিনি। তারুণ্যে উজ্জ্বল একজন প্রধান শিক্ষক। বেশিদিন হয়নি, প্রধান শিক্ষক পদে নিযুক্ত হয়েছেন গোকুলপুর আদর্শ শিক্ষায়তনে। রবীন্দ্র জীবন আলোচনা প্রসঙ্গে তিনি কবির চিত্রশিল্পের বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে বলতে গিয়ে প্রখ্যাত আন্তর্জাতিক চিত্রশিল্পী পাবলো পিকাসোর শিল্পকর্মের বৈশিষ্ট্যের সঙ্গে কবির শিল্পকর্মের সামঞ্জস্যের কথা আলোচনায় আনেন। অনেক পুরানো দিনের স্মৃতি আমার স্মৃতিকোঠায় বিশেষ মজুত থাকে না; আমি বিস্মৃতির ঘোরে অনেক ক্ষেত্রেই আক্রান্ত; কিন্তু মাস্টারমশাইয়ের সেদিনের ওই আলোচনা আমাকে প্রাণিত করেছিল, যা আমার মন থেকে আজও মুছে যায়নি।

একই সমাজদর্শনের পথিক হিসেবে, মত ও পথের একই দিশা নিয়ে চলার পথে সত্তরের দশকে কখনো বা তাঁকে কোনও সভা-সমিতিতে দেখতে পেয়েছিলাম।

সত্তরের দশক যেমন দমন-পীড়ন ও যন্ত্রণার দশক, তেমনি প্রতিবাদের দশক, ঐক্যবদ্ধতার দশক--এক সম্ভাবনার দশক। নানা সম্ভাবনার উৎসগুলির মধ্যে দাঁড়িয়ে একটি ভাবনাকে রূপ দেবার তাগিদে ক'জন বন্ধুকে সম্মিলিত করে এগিয়ে চলার পথে পা রাখলাম।

আমাদের এই রবিতীর্থের সাংগঠনিক পথচলা স্থির করতে গিয়ে কখনোই রাজনীতি, প্রশাসন, ব্যক্তিগত সম্পর্ক এসবের দিকে ঝুঁকে পড়ার ইচ্ছা জাগেনি বা তাগিদ অনুভূত হয়নি। তাই আমাদের সংগঠক শিক্ষক ক'জনার বাইরে এই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের কর্মসমিতির মধ্যে আর কোন কোন ব্যক্তিকে আহ্বান জানাবো সে কথা ভাবতে গিয়ে আমরা স্থির করি যে, প্রথমত উদ্বাস্তু পি-এল হোমের সরকারি একজন আধিকারিক আমাদের সঙ্গে থাকুন। দ্বিতীয়ত স্বত:স্ফূর্তভাবে অঞ্চলবাসীদের মধ্যে যাঁরা সাহায্যের হাত বাড়িয়ে ছিলেন তাঁদের মধ্যে অন্যতম রতনকৃষ্ণ দে, বিমল ব্রহ্ম, উপেন্দ্রনাথ হালদার প্রমুখ ব্যক্তিবর্গের বিশেষ উল্লেখযোগ্য ভূমিকা ছিল। এনারা প্রথমদিকে নিয়মিত সংযোগ রেখেছিলেন। এই সঙ্গে আমরা স্থির করি পাশ্ববর্তী দুটি হাইস্কুলের প্রধান শিক্ষক আমাদের সঙ্গে যুক্ত হউন। চাঁদমারি দেশপ্রিয় শিক্ষায়তনের প্রধান শিক্ষক মাননীয় সত্যরঞ্জন কয়ালের বাসস্থান দূরে হওয়ায় সহ: প্রধান শিক্ষক মাননীয় শান্তিরঞ্জন ভট্টাচার্যকে কমিটিতে যুক্ত হবার জন্য আহ্বান জানাই। গোকুলপুর আদর্শ শিক্ষায়তনের প্রধান শিক্ষক মাননীয় নরেশচন্দ্র কংসবণিক মহাশয়কে ঠিক এভাবেই আহ্বান জানাই এবং তিনি যুক্ত হতে সম্মতি প্রকাশ করেন। প্রথম দিকে বেশ কিছু বছর মাননীয় উপেন্দ্রনাথ হালদার মহাশয় কর্মসমিতির সভাপতির পদে আসীন থাকেন। এর পরবর্তী পর্যায়ে প্রায় তিন দশক কাল একটানা

সভাপতি পদে আসীন থাকেন মাননীয় মাস্টারমশাই নরেশচন্দ্র কংসবণিক। ঠিক এই সময়কালেই স্কুলে কতনা সমস্যার ঢেউ আছড়ে পড়া, আশা-নিরাশা ও এগিয়ে চলার কত বিচিত্র ধাপ অতিক্রম করতে হয়।

সবচেয়ে স্মরণীয় মুহূর্তটি আসে ১৯৯২ সালে। স্কুলের এগিয়ে চলার পথে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সন্ধিক্ষণ। এ-বি-টি-এ সংগঠনের শীর্ষস্থানীয় ব্যক্তিত্ব, এই স্কুলের অকৃত্রিম শুভাকাঙ্ক্ষী, বর্তমানে প্রয়াত, মাননীয় অমল ব্যানার্জীর পরামর্শ ও পথনির্দেশে রবিতীর্থ প্রাথমিক স্তর থেকে মাধ্যমিক বিদ্যালয় স্তরে যাত্রা শুরু করে। শিক্ষক-শিক্ষাকর্মী-অভিভাবক ও শুভানুধ্যায়ীদের নিয়ে এক সভা অনুষ্ঠিত হয়, যে সভাটি সভাপতি হিসাবে পরিচালনা করেন মাননীয় নরেশচন্দ্র কংসবণিক। সভার তারিখটি ছিল ১২ ই জানুয়ারি, ১৯৯২। স্কুলের চতুর্থ শ্রেণি উত্তীর্ণ ছাত্রছাত্রীরা ১৯৯২ সালে এই স্কুলেই পঞ্চম শ্রেণিতে পড়তে পারবে এবং ক্রমশ তারা এই স্কুলেই এক একটি উচ্চতর শ্রেণি পার হয়ে মাধ্যমিক স্তর অতিক্রম করবে।

সে বছরই পশ্চিমবঙ্গ বিজ্ঞান মঞ্চের নদীয়া জেলা কমিটি স্থির করে যে, সেপ্টেম্বর মাসে কেরালাতে যে জাতীয় বিজ্ঞান উৎসব অনুষ্ঠিত হবে তাতে নদীয়া জেলা থেকে শিক্ষক হিসেবে প্রতিনিধিত্ব করবো আমরা দুজন---নরেশচন্দ্র কংসবণিক এবং আমি। আর গয়েশপুর পৌর অঞ্চলেরই পাঁচটি স্কুল থেকে একজন করে মোট পাঁচজন ছাত্রছাত্রী নির্বাচিত হয়। কেরালাতে সাতদিন ব্যাপি বিজ্ঞান উৎসব বা বিজ্ঞান, সমাজ, সৃষ্টি, কৃষ্টি নিয়ে যে কর্মকাণ্ড তার অসাধারণ স্মৃতি বহন করে আমরা ফিরেছিলাম।

সে বছর ডিসেম্বর মাসের শেষ সপ্তাহে যে নদীয়া জেলা শিশু বিজ্ঞান উৎসব অনুষ্ঠিত হয়েছিল এই রবিতীর্থে, তার রূপরেখা রচিত হয় মাস্টারমশাই নরেশবাবুর বাড়িতে বসে। ডঃ শান্তনু ঝা এসেছিলেন, আলোচনায় উপস্থিত ছিলেন দুলাল দে আর আমি। বলা বাহুল্য, নদীয়া জেলা শিশু বিজ্ঞান উৎসব স্কুলের ক্ষেত্রে এবং এ অঞ্চলের ক্ষেত্রে এক স্মরণীয় ঘটনা।

স্কুলে মাধ্যমিক স্তরের উপযুক্ত শিক্ষক-শিক্ষিকা নিয়োগ প্রক্রিয়ার প্রতিটি ধাপে মাস্টারমশাইয়ের সংযোগ ও ভূমিকা ছিল গুরুত্বপূর্ণ। আর এ সময়ই শিক্ষক-শিক্ষিকা হিসেবে যাঁরা নিযুক্ত হন তাঁরা অধিকাংশই স্কুলের পরবর্তী অগ্রগতি এবং নানা আঁকাবাঁকা পথ পেরোনোর ক্ষেত্রে উজ্জ্বল ভূমিকা পালন করেন। ১৯৯৭ সালে স্কুল অষ্টম শ্রেণিতে উন্নীত হলো। স্কুলের সরকারি স্বীকৃতির জন্য তখন ছুটোছুটি চলছে। আর্থিক সাহায্যহীন স্বীকৃতি (Nil-grant recognisation) বিভিন্ন উৎস থেকে স্বীকৃতির জন্য সুপারিশ সংগ্রহ করার প্রচেষ্টা চলছে। অত্যন্ত প্রয়োজনীয় যে সুপারিশ তা হলো আঞ্চলিক প্রশাসন অর্থাৎ গয়েশপুর পৌরসভার পক্ষ থেকে সুপারিশ। মাননীয় নরেশবাবু তখন পৌরসভার চেয়ারম্যান। অত্যন্ত উপযোগী কার্যকরী একটি সুপারিশ পত্র লিখে দিলেন।

এই স্কুল জুনিয়র হাইস্কুল (অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত) রূপে প্রাথমিক স্বীকৃতি লাভ করবে। স্বীকৃতি সংক্রান্ত কাজ শিক্ষা দপ্তরে এগিয়ে চলছে। তারই মাঝে কিছু মানসিক চাপ তাড়া করে বেড়াচ্ছিল। তার মধ্যে অন্যতম ছিল প্রথম ব্যাচের ছাত্রছাত্রী, যাদের নিয়ে পঞ্চম শ্রেণির পাঠ শুরু করে অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত পৌঁছেছিলাম। স্কুলের প্রাথমিক স্বীকৃতি চূড়ান্ত না হওয়ায় অষ্টম শ্রেণি উত্তীর্ণ ছাত্রছাত্রীরা এই স্কুলেই নবম শ্রেণির পাঠ নিতে পারবে কিনা। এই প্রশ্নে স্বয়ং মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী

নেতিবাচক জবাব দিয়েছিলেন। অতএব কো-এড স্কুল হিসেবে একমাত্র গোকুলপুর আদর্শ শিক্ষায়তনে ওই বাইশ/তেইশ জন ছাত্রছাত্রীকে নবম শ্রেণিতে ভর্তি করে দিলে ওরা এক জায়গায় থাকতে পারবে। ওই স্কুলের প্রধান শিক্ষক নরেশবাবু। কিন্তু বাধ সাধলেন ওই স্কুলের শিক্ষক সংগঠনের গোড়া অনমনীয় ব্যক্তিবর্গ। নরেশবাবু যে অধিষ্ঠানেই থাকুন না কেন, ব্যক্তিগত নমনীয়তার বেড়া ভেঙে কখনোই অনমনীয় হতে পারেননি। ওই ছেলেমেয়েদের অধিকাংশ দেশপ্রিয় শিক্ষায়তন ও নগেন্দ্র বালা বালিকা বিদ্যালয়ের নবম শ্রেণিতে ভর্তি হয়েছিল; দু একজন হার্নেট হাইস্কুলে। এরা প্রত্যেকেই ১৯৯৮ সালের মাধ্যমিক পরীক্ষায় অত্যন্ত গৌরবজনক সাফল্য অর্জন করেছিল।

মাস্টারমশাই নরেশবাবুর নমনীয় কোমল মনোভাব তাঁকে এক বিশেষ স্থানে অধিষ্ঠিত রেখেছিল। আর সে কারণেই অনেক যুক্তি বুদ্ধির আড়ালে হয়তো তাঁর ব্যক্তিগত ইচ্ছা-অনুভূতি প্রবল হয়ে উঠতে পারেনি। পৌর প্রশাসন, রাজনৈতিক অঙ্গন, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সব ক্ষেত্রেই তাঁর নমনীয়তার ভূমিকার ক্ষেত্রে তিনি তাঁর নিজস্ব লক্ষ্মণ রেখা অতিক্রম করার কথা ভাবতে পারেননি।

স্কুলের অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত (জুনিয়র হাই) সরকারি স্বীকৃতি লাভ মাস্টারমশাই সহ আমাদের সবার ক্ষেত্রে ছিল অত্যন্ত আনন্দ সংবাদ। একই সঙ্গে আমাদের শিক্ষক-শিক্ষিকাদের উপযুক্ত প্রশিক্ষণের জন্য আরও ফলপ্রসূ উদ্যোগ কীভাবে নেওয়া যায় তার প্রচেষ্টা শুরু হল। রাজ্যস্তরের কয়েকজন বিশেষজ্ঞ শিক্ষককে আমাদের শিক্ষণ বিষয়ক কর্মশালায় আমন্ত্রণ জানানো হলো। প্রতিটি কর্মশালায় মাননীয় নরেশবাবুর উপস্থিতি ও বিশেষ ভূমিকা থাকত।

শিক্ষাদপ্তর স্কুলকে স্বীকৃতি দিয়েছে এই শর্তে যে স্কুল কোনও সরকারি আর্থিক অনুদান পাবে না এবং স্কুলের পক্ষেও কোনও আর্থিক সাহায্যের দাবি করা যাবে না। স্কুল পরিচালনার জন্য যা কিছু আর্থিক দায়বদ্ধতা তা বহন করতে হবে স্কুলের সংগঠক সোসাইটিকেই। অথচ স্কুলের ম্যানেজিং কমিটি গঠনের বিষয়ে বাইরের হস্তক্ষেপ এড়ানোর জন্য সরকারের নির্দেশিকায় কোনও রক্ষাকবচ রাখা হয়নি। ম্যানেজিং কমিটি গঠন নিয়ে আঞ্চলিক রাজনৈতিক ক্ষেত্রের অসুস্থ মানসিকতা ভয়ঙ্কর হয়ে উঠেছিল। স্কুলের উপর চরম অনৈতিকতা ও শক্তি প্রয়োগ এমন স্তরে পৌঁছেছিল যে নরেশবাবু বামপন্থী রাজনৈতিক কাজের ক্ষেত্রে শীর্ষ স্থানীয়দের মধ্যে একজন হওয়া সত্ত্বেও এবং স্কুলের প্রশাসনে তাঁর অন্যতম প্রধান ভূমিকা থাকা সত্ত্বেও আঞ্চলিক নেতৃত্বের রশি যাঁদের হাতে ধরা ছিল তাঁরা তাঁদের সংকীর্ণ অভিসন্ধি চরিতার্থ করার জন্য ছিলেন চরম কুটিল ও নির্মম। ন্যায়, সত্যতা , বিবেক এসব কিছুকেই তাঁরা তুচ্ছ জ্ঞান করতেন। রবিতীর্থকে সংহার করতে গিয়ে তাই তাঁরা নরেশবাবুর মতামত ও পরামর্শকে যেমন অগ্রাহ্য করেছিলেন, তেমনি স্কুলের শিক্ষক শিক্ষিকাদের মধ্যে বামপন্থী সংগ্রাম আন্দোলনে যুক্ত থেকে যাঁরা অনেক যন্ত্রণা লাঞ্ছনা ভোগ করেছেন তাঁদের প্রতি ছিল অসম্মান ও বিদ্বেষ।

এইরূপ বাতাবরণে যখন স্কুলের স্বকীয়তা, শিক্ষক-শিক্ষিকা-শিক্ষাকর্মীদের সততা, ঐক্য ও অখণ্ডতা নিয়ে যে প্রতিষ্ঠান পরিচালনা তাকে রক্ষা করা এক বড় উদ্দেশ্য হয়ে উঠেছে, তখন যে বিষয়টিকে কেন্দ্র করে স্কুলের ক্ষমতা করায়ত্ত করার অপচেষ্টা শুরু হয়েছিল তা হলো মাধ্যমিক বিদ্যালয় বিভাগের প্রধান শিক্ষক পদে জনৈক ব্যক্তিকে স্থায়ীভাবে নিযুক্ত করা।

অথচ যে ব্যক্তিকে তাঁরা শিখণ্ডী করে রনংদেহী রূপ নিয়ে অগ্রসর হলেন তাঁকে কিন্তু মাধ্যমিক বিদ্যালয় বিভাগের ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষকের পদে ইতিমধ্যেই আসীন করা হয়েছিল। কিন্তু যখন বোঝা গেল যে যাঁকে আমরা সম্মানের আসনে বসালাম তিনি নিজেই সংকীর্ণ রাজনীতির কাছে আত্মসমর্পণ করলেন, তখন সামগ্রিক অপচেষ্টার বিরুদ্ধে সামিল হতে হলো। এই অপচেষ্টাকে চূড়ান্ত ভাবে প্রতিহত করা সম্ভব হলো যখন অবসরপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক মাননীয় নরেশচন্দ্র কংসবণিক মহাশয়কে আইনী প্রক্রিয়ার মাধ্যমে প্রধান শিক্ষক পদে নিয়োগ করা সম্ভব হলো। সে-সঙ্গে স্কুল পরিচালনার ক্ষেত্রে মানসিক চাপ ও স্কুলের গঠনমূলক কাজের ক্ষেত্রে দীর্ঘ সময়ের প্রতিবন্ধকতার এক দু:সহ অধ্যায়ের অবসান ঘটলো। বয়সের ভার নিয়েও মাস্টারমশাই বছর ছয়েক টানা এই দায়িত্ব পালন করেছেন। প্রধান শিক্ষক হিসেবে তাঁর ওই ক'বছরের বিশেষ ভূমিকা স্কুলের ইতিহাসে দীপ্তিময় হয়ে আছে।

বিগত প্রায় দেড় দশক সময়কাল স্কুলের উন্নয়ন, সমৃদ্ধি, শিক্ষার পরিবেশ ও শিক্ষার মানোন্নয়নের ক্ষেত্রে এক উল্লেখযোগ্য সময়। স্কুলের কর্মসমিতির সর্বাপেক্ষা প্রবীণ সদস্য তথা অভিভাবক হিসেবে শ্রদ্ধেয় মাস্টারমশাই প্রতিটি পদক্ষেপে সান্নিধ্য ও পরামর্শ দিয়েছেন। একজন অনুজ হিসেবে তাঁর সান্নিধ্যে থেকেছি প্রায় পাঁচ দশক। এই সান্নিধ্য শ্রদ্ধা ও স্নেহের বাঁধনে অনেক ক্ষেত্রে অগ্রজ ও অনুজের পারস্পরিক অধিকারবোধের জায়গায় পৌঁছে গিয়েছিল।

শ্রদ্ধেয় মাস্টারমশাইয়ের চলে যাওয়া আমাদের কাছে অত্যন্ত আকস্মিক। তাঁর শারীরিক অসুস্থতার বিষয়ে ইতিমধ্যে দু দুবার বেশ বড় রকমের ঝড় তিনি সামলে উঠেছিলেন। সর্বশেষ তাঁর পেসমেকার বসার দিন কলকাতার হাসপাতালে রুদ্ধশ্বাস দিনের শেষে তাঁর বেডের পাশে পৌঁছে উভয়ের সহাস্য কথোপকথনের মাঝে মাস্টারমশায়কে এই বলে আশ্বস্ত করতে পেরেছিলাম যে আমি নিজে বাইশ বছর বুকে পেসমেকার বহন করছি, দুবার ইম্প্ল্যান্টেশন হয়েছে এবং এজন্য শারীরিক কোনও অসুবিধা কখনোই হয়নি। বাস্তবিক মাস্টারমশাই শারীরিক অসুবিধা থেকে অনেকটাই মুক্ত হতে পেরেছিলেন। জেনেছিলাম, যেদিন তাঁর শেষ নি:শ্বাস পড়লো, সেদিন সকালেও তিনি রোজকার মতো বাগানের পরিচর্যা করেছেন। তাঁকে দীর্ঘ রোগাক্রান্ত সামর্থ্যহীন অসহায়তা নিয়ে চলে যেতে হয়নি। এ এক আশীর্বাদ।

স্কুলের সুবর্ণজয়ন্তী উৎসবের প্রস্তুতি শুরু হতে চলেছে। এই উৎসবে সামিল থাকবেন এই আশা নিয়ে মুহূর্তগুলি পার করছিলেন মাস্টারমশাই। আমরা চরম আশাহত হলাম।

বেদীভবন রবিতীর্থের সভাগুলিতে আজ এক শূন্যতার বিষাদময়তার আবহ।

সংগঠক বন্ধুদের সঙ্গে নিয়ে অনেকটা পথ তো পার হওয়া গেল। জীবন নশ্বর, বড়ই ভঙ্গুর। তাই ব্যষ্টির ভাবনা ও কাজের উৎস থেকে সমষ্টির যে ব্রত এবং অভিযান তার স্থিতি ও গতিকে অব্যাহত রাখতে চাই অকপট বরাভয়পূর্ণ শক্তি। মাস্টারমশাই এবং তাঁর মতো অনন্তচারীদের আশীর্বাদ এই শক্তিকে প্রভাময় করে তুলুক।

মাস্টারমশাই

দুলাল দে, উপাধ্যক্ষ

মাস্টারমশাই নামটা শুনলে প্রতিটি শিরা উপশিরাতে একটা গর্বের স্পন্দন বইতে থাকে। নরেশ বাবুকে পরিচয়ের প্রথম দিন থেকে 'মাস্টারমশাই' বলেই সম্বোধন করতাম। তাঁর নামটি প্রথম শুনতে পাই সত্তর দশকের মাঝামাঝি। কল্যাণীতে একজন প্রাইভেট টিউটর আমাকে বললেন, "তোমাদের গোকুলপুরে বেড়ার হাইস্কুলে একজন হেডস্যার এসেছেন, তিনি নাকি খুব ভালো, তাঁর পদবীটা কেমন একটা। এ অঞ্চলে এই পদবী খুব একটা শোনা যায়না।" পরে জেনেছি নামটা নরেশ চন্দ্র কংসবনিক। তবে ওই বেড়ার স্কুল বলতে আমার মনে পড়ে গেল আমার শিক্ষক পরম শ্রদ্ধেয় প্রয়াত নিরঞ্জন চক্রবর্তী মহাশয়ের কথা, যিনি ওই স্কুল গড়ার প্রধান উদ্যোক্তাদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন, তখন যা বেড়ার স্কুল নামে খ্যাত ছিল। আজ তা পরিপূর্ণ রূপে গোকুলপুর অঞ্চলে আদর্শ শিক্ষায়তন নামে শিক্ষার আলোকে প্রসারিত হয়েছে। ভাবতে ভালো লাগে।

উদ্বাস্তু অঞ্চলে শিক্ষার প্রয়োজন অনুভব করেছিলেন তৎকালীন উদ্যোক্তারা। সদ্য গড়ে ওঠা বিদ্যালয়ের হাল ধরলেন নরেশ চন্দ্র কংসবনিক। সম্ভবত ১৯৭৫ সালের সেপ্টেম্বর মাসে চাঁদমারি দেশপ্রিয় শিক্ষায়তনের পক্ষ থেকে আদর্শ শিক্ষায়তনের একটি বিশেষ অনুষ্ঠানে ওই স্কুলের প্রয়াত শিক্ষক অনিল বিশ্বাস আমার সঙ্গে নরেশ চন্দ্র কংস বনিকের প্রথম পরিচয় করিয়ে দেন। তারপর আর বিশেষ যোগাযোগ ছিল না। পরবর্তী কালে আমাদের রবিতীর্থ বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার সময় যাঁদের পরামর্শ দরকার তাঁদের মধ্যে ছিলেন দেশপ্রিয় শিক্ষায়তনের প্রয়াত প্রধান শিক্ষক সত্যরঞ্জন কয়াল, শান্তিরঞ্জন ভট্টাচার্য, নরেশ চন্দ্র কংসবনিক প্রমুখ। রবিতীর্থ বিদ্যালয়ে যুক্ত হবার পর আমি ও আমাদের অধ্যক্ষ মধুসূদন চক্রবর্তী মাস্টারমশাইয়ের বাড়িতে যাই। মাস্টারমশাইয়ের স্ত্রী পরম শ্রদ্ধেয়া মমতা দেবীও আমাদের সাদরে আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন। উনি অত্যন্ত খুশি হয়ে রবিতীর্থের সঙ্গে যুক্ত হলেন।

বিভিন্ন কর্মকান্ডে মাস্টারমশাই আমাদের সঙ্গে বন্ধুর মত অংশগ্রহণ করতেন। ১৯৮০ সালের গোড়ার দিকে একটি সাংস্কৃতিক মঞ্চ তৈরি হয়েছিল। বিভিন্ন স্থানে সাইকেলে চেপে, পায়ে হেঁটে আমাদের সঙ্গে থেকে সাংস্কৃতিক মঞ্চকে সমৃদ্ধ করেছেন। পরবর্তী সময়ে সাংস্কৃতিক মঞ্চটি বিলুপ্ত হয়ে যায়। রবিতীর্থের ক্ষেত্রে যে কথাটি আমার পক্ষে না বললেই নয়, তা হল, রবিতীর্থে ১৯৮০ সাল নাগাদ কলাকেন্দ্র শুরু হল সঙ্গীত, তবলা ও নৃত্য দিয়ে। চিত্রাঙ্কন বিভাগটি খোলার চেষ্টা হল। কিন্তু শিক্ষার্থী কোথায়? মাস্টারমশাই বললেন, " তুমি যদি চিত্রাঙ্কন বিভাগটি শুরু করো তাহলে আমার ছেলে রাজর্ষিকে দিয়ে শুরু করতে পারো, একটাই শর্ত, আমি তো বিভিন্ন কাজে ব্যস্ত থাকি,

তোমার বৌদি (মমতা কংসবনিক), রাজর্ষি ও ছোট মেয়ে মানিনী হেঁটে যাবে, তুমি সন্ধ্যেবেলাটা ওদের পৌঁছে দেবে" । তখন এ অঞ্চলে রাস্তাঘাটে আলোর ব্যবস্থা ছিল না।

মানিনী তখন খুবই ছোট, গুটি গুটি পায়ে হেঁটে যেত। সন্ধ্যে হয়ে গেলে ওদের বাড়িতে পৌঁছে দিতাম। মানিনী এখন বিবাহসূত্রে দিল্লিতে থাকে। তার এই শিল্প চর্চা এখনও অব্যাহত। মানিনীর আঁকা কোনও ভালো ছবি মাস্টারমশাই মাঝে মাঝে আমাকে Whatsapp-এ পাঠাতেন। মাস্টারমশাইয়ের উদ্যোগে রবিতীর্থে চিত্রাঙ্কন বিভাগ শুরু হল। একে একে অনেক শিক্ষার্থী ভর্তি হল। সেই সময়ে প্রাতিষ্ঠানিক ভাবে চিত্রাঙ্কন বিভাগটি আমাদের রবিতীর্থে প্রথম শুরু হয়, আজও সে ধারা বয়ে চলেছে।

নব্বইয়ের দশকের গোড়ার দিকে তিনি তখন গয়েশপুর পৌরসভার চেয়ারম্যান, একবার আমাকে একটি পৌরসভার 'লোগো' তৈরি করার অনুরোধ করেছিলেন, নানা ব্যস্ততার কারণে মাস্টারমশাইয়ের সেই কাজটি করতে পারিনি। সেটা করতে পারলে আমার খুবই ভালো লাগত। তাঁর অনুরোধ রাখতে না পারার একটি ছোট্ট ক্ষত থেকে গেল চিরকালের মত।

তাঁর অধিকাংশ ছাত্র ছাত্রীরা ছিল আমাদের পরিচিত। তাঁর শিক্ষার্থীরা তাঁর ছাত্র ছাত্রী হিসেবে গর্ব বোধ করে। তাঁর শিক্ষার্থীরা পুরোনো স্মৃতি রোমন্থন করে অত্যন্ত তৃপ্তি পেতে থাকে। তাঁর শ্রদ্ধার স্থানটি দলমত নির্বিশেষে এক। তাঁর বিশ্বভ্রমণের গল্প বলা যেন আমাদের কল্পনা থেকে বাস্তবে রূপ নিত। আমাদের বিদ্যালয়ে প্রতিটি কাজের সঙ্গে যুক্ত থেকে আমাদের চালিকা শক্তিকে বৃদ্ধি করেছেন। অসুস্থতা নিয়েও তিনি বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানিক কাজে উপস্থিত থাকতেন। যে কোনও কঠিন সমস্যাকে সমাধান করার সরল সূত্র ছিল তাঁর কাছে। পুঞ্জীভূত অনেক স্মৃতি জমা হয়ে থাকবে। নার্সিং হোমে মাস্টারমশাই প্রয়াত হওয়ার খবর শুনে তৎক্ষণাৎ উপস্থিত হলাম। কিন্তু পরের দিন বিদ্যালয়ে তাঁর মরদেহ যখন এসেছে তখন আমি উপস্থিত ছিলাম না। কারণ সেদিনটি পূর্ব নির্ধারিত হুগলীতে অনুষ্ঠিত একটি আর্ট ওয়ার্কশপে যেতে হয়েছিল। সেদিনের অনুপস্থিতি আমার জীবনে আরও একটি ক্ষত রয়ে গেল। তাঁর সরল কর্মজীবন, ব্যক্তিগত জীবন ও কর্মক্ষমতা আমার সারাজীবনের স্মৃতি হয়ে থাকবে।

আমাদের মাস্টারমশাই

সুনীল সাহা, সংগঠক শিক্ষক

মাননীয় নরেশচন্দ্র কংসবনিক, আমার মাস্টারমশাই- আমাদের মাস্টারমশাই। আমি তাঁর ছাত্র নই, তবুও তিনি আমার মাস্টারমশাই। এই অঞ্চলের অনেকেই তাঁর ছাত্র বা ছাত্রী নন, তবুও তিনি সকলের মাস্টার মশাই। তিনি আদর্শ শিক্ষায়তনের প্রধান শিক্ষক। আদর্শ ব্যক্তির স্পর্শে নড়বড়ে দরমার বেড়াঘেরা বিদ্যালয় ক্রমে ক্রমে অট্টালিকায় পরিণত হয়েছে। শুধু ঘর-বাড়ি মজবুত নয় তাঁর সুদক্ষ পরিচালনায় আদর্শ শিক্ষায়তন এতদ্ অঞ্চলে এক আদর্শ বিদ্যালয়ে পরিণত হয়েছে। তাঁর চলা-ফেরা, বেশভূষা, বাচনভঙ্গি, আচার-আচরণ এই অঞ্চলের সর্বস্তরের মানুষের মনে একটা গভীর ছাপ ফেলেছে। ভাবতে অবাক লাগে মাস্টার মশায়ের সাথে আমার প্রায় অর্ধশত বৎসর যাবৎ পরিচয়- এই সুদীর্ঘকালে কখনোই আমি মাস্টারমশাইকে সাদা পোশাক ছাড়া অন্য পোশাকে দেখিনি। ফুলের মত সুন্দর মাস্টারমশায়ের মন, তাইতো তিনি যতদিন বেঁচে ছিলেন নিজের হাতে গড়ে তোলা ফুলবাগানে জীবনের একটা বড় সময় কাটিয়ে দিতেন। মাঝে মাঝে মাস্টার মশায়ের পাঠানো ফুলের নানাবিধ সৌন্দর্য আমি হোয়াটসঅ্যাপে উপভোগ করতাম- মনটা ভরে যেত, চোখে ভেসে উঠত কতটা স্নেহ-মায়া-মমতা ও আদর নিয়ে মাস্টারমশাই দিনের পর দিন ফুলের সৌন্দর্য সৃষ্টি করে চলেছেন। বেদীভবন রবিতীর্থ, যে প্রতিষ্ঠানের সাথে মাস্টারমশাই-র ছিল নাড়ির টান। রবিতীর্থ ছিল মাস্টারমশাইর স্বস্তির জায়গা। আর রবিতীর্থ পেয়েছিল মাস্টার মশাইয়ের মতো এক মহান দায়িত্ববান অভিভাবককে। মাস্টার মশাই ছিলেন রবিতীর্থের বটবৃক্ষ। এই বৃহৎ পরিবারের যেকোনো সমস্যা সুন্দর সাবলীল ভাবে মিটিয়ে দেওয়ার ক্ষমতা ছিল মাস্টারমশাই-র। তাঁর সুললিত, দীপ্ত, যুক্তিপূর্ণ সরল সহজ বক্তব্য আমাদেরকে মুগ্ধ করতো। কোথায় তাঁর বিচরণ ছিল না। রাজনীতি, খেলার জগৎ , বিজ্ঞান মঞ্চ, সাংস্কৃতিক আন্দোলন, প্রশাসনিক ক্ষেত্র সর্বত্রই তিনি অত্যন্ত দক্ষতা ও সাফল্যের সাথে বিচরণ করেছেন। আর ভ্রমণ! তিনি শুধু ভ্রমণ পিপাসু ছিলেন না। তাঁর ভ্রমণের অভিজ্ঞতা ও আনন্দের মুহূর্ত সমন্বিত বিভিন্ন ভ্রমণ কাহিনী আমাদের সমৃদ্ধ করেছে- মুগ্ধ করেছে। এ হেন এক ব্যক্তিত্ব আর আমাদের মধ্যে নেই। তাঁর নশ্বর দেহ বিলীন হয়েছে। কিন্তু তাঁর আদর্শ, তাঁর কৃতিত্ব তাঁর সৃষ্টির মাঝে তিনি অমর হয়ে থাকবেন। প্রতিটি ক্ষণের, প্রতিটি মুহূর্ত আমরা তার উপস্থিতি অনুভব করব। মাননীয় নরেশ চন্দ্র কংসবনিক ইহলোক ত্যাগ করেছেন- কিন্তু আমাদের মধ্যে বেঁচে আছেন এবং চিরকাল বেঁচে থাকবেন আমাদের শ্রদ্ধেয় মাস্টার মশাই।

আলোর পথযাত্রী আমাদের নরেশ বাবু

ড: কিংশুক চক্রবর্তী, প্রধান শিক্ষক

আমি জানতাম না নরেশ বাবুর সঙ্গে আমার এত সম্পর্ক । তখন আমি গাঙনাপুর প্রাথমিক বিদ্যালয়ে সবে মাত্র ভর্তি হয়েছি কি হইনি। সদ্য পঁচিশে পা রাখা যুবক শ্রী নরেশচন্দ্র কংসবণিক কল্যাণী পান্নালাল ইনস্টিটিউশনে শিক্ষকতায় যুক্ত হলেন । বিধাতা লিখলেন, পৃথিবী সময় দাও - - নরেশ বাবুর স্কুলে এই শিশু প্রধান শিক্ষক পদে নিযুক্ত হবেন। নরেশ বাবুর স্নেহের পরশে মনপ্রাণ স্নিগ্ধ হবে। হ্যাঁ আমি পান্নালাল ইন্সটিটিউশনে .শিক্ষকতায় যুক্ত হলাম কিন্তু কোথায়! নরেশ বাবুর কোন চিহ্ন তো আমায় স্পর্শ করল না।তিনি তখন কাটাগঞ্জ গোকুলপুর আদর্শ শিক্ষায়তনের প্রধান শিক্ষক। সময় এগিয়ে গেল, শ্রদ্ধেয় নরেশচন্দ্র কংসবণিক মহাশয়ের সঙ্গে আমার দেখা হওয়ার কোনো সম্ভাবনা তৈরি হল না।

পান্নালাল ইন্সটিটিউশন ছেড়ে চলে গেলাম দূরে শান্তিপুর মিউনিসিপ্যাল উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে প্রধান শিক্ষকের দায়িত্ব নিয়ে। ২০০৭ সাল এপ্রিল মাসের প্রখর রোদ মাথায় নিয়ে সমাজের রক্ষণশীল কর্তাদের রক্তচক্ষু উপেক্ষা করে যখন বেদীভবন রবিতীর্থ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক নিয়োগ প্রক্রিয়ায় এক্সপার্ট হিসেবে পৌঁছলাম দেখলাম যাঁকে নিয়োগ করার জন্য আমার এই শুভাগমন তিনি শ্রদ্ধেয় নরেশচন্দ্র কংসবণিক। তাঁকে এই প্রথম দেখলাম । শান্ত শুভ্র ব্যক্তিত্বময় একজন আদর্শ শিক্ষক। প্রণাম করতে ইচ্ছে করল। সেই অপরাহ্নের কথা আজও স্পষ্ট মনে পড়ে। তৎকালীন সমাজ রক্ষকদের নির্দেশ অমান্য করে শ্রদ্ধেয় নরেশচন্দ্র কংসবণিক মহাশয়কে বেদীভবন রবিতীর্থ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষকের পদে অভিষিক্ত করে খুব আনন্দের সঙ্গে যখন বাড়ি ফিরছিলাম; বার বার রবি ঠাকুরের ঐ লাইনগুলো মনে পড়ছিল --মুক্ত করো ভয়, আপনা মাঝে শক্তি ধরো নিজেরে করো জয়- - - - -। সেই প্রথম আমার বেদীভবন রবিতীর্থ বিদ্যালয়ের সঙ্গে পরিচয়। সময় এগিয়ে চলল - - - - "কুসুমিত তরুতলে তরুণ-তরুণী তুলিল অশোক-মোর হাতে দিয়া তারা কহিল, 'এ আমাদেরই লোক'- - -।" আমি রবিতীর্থ সোসাইটির সদস্য হলাম। সুযোগ পেলাম নরেশচন্দ্র কংসবণিক মহাশয়ের মুখোমুখি বসিবার । ঠিক যেন বনলতা সেন। যে দুদণ্ড শান্তি দিতে পারে। ধীরে ধীরে নয় একেবারে বিদ্যুৎ গতিতে শ্রদ্ধেয় নরেশচন্দ্র কংসবণিকের স্নেহধন্য হয়ে উঠলাম। আমি তাঁকে নিয়মিত নিজের মনে মনে চর্চা করতে শুরু করলাম। চর্চা করতে করতে প্রথম যেটা আবিষ্কার করলাম সেটা হল ইনি প্রকৃতই একজন সর্বজন শ্রদ্ধেয় মানুষ। কীভাবে এত বড় শ্রদ্ধার আসন পেলেন? এই জিজ্ঞাসার উত্তরে খুঁজতে গিয়ে পেলাম দুটি পথ। এক --- তিনি সবারে দেন মান সে মান আপনি ফিরে পান। দুই -- তাঁর নন ইগোইস্টিক জীবন দর্শন। দীর্ঘ প্রায় দুই দশক তাঁর সান্নিধ্যে থেকে উপলব্ধি করেছি তিনি অনন্য কারণ তাঁর মনমুগ্ধকর

স্মরণ

উনত্রিশ বছর কাটাগঞ্জ গোকুলপুর আদর্শ শিক্ষায়তনে প্রধান শিক্ষকের দায়িত্ব পালন করে বিদ্যালয়কে চারাগাছ থেকে মহীরুহতে পরিণত করেছেন। তারপর সঙ্কটকালীন সময়ে বেদীভবন রবিতীর্থ বিদ্যালয়ে প্রধান শিক্ষকের দায়িত্ব পালন করতে হয়। পরবর্তীতে তাঁর আসনে আমাকে বসতে হয়। তিনি আমাকে তাঁর ছাত্রই মনে করতেন। প্রায় নিয়মিত আমাকে ফোন করে বিভিন্ন বিষয়ে আলোচনা করতেন। ভ্রমণের কথাই বেশি। তিনি ছিলেন বিশ্ব পর্যটক। ইংরাজীতে যাকে আমরা বলি globe trottar . শ্রদ্ধেয় নরেশচন্দ্র কংসবণিক মহাশয়ের সঙ্গে আমার একটা বিশেষ সম্পর্ক ছিল -- আমরা সহযাত্রী। বেদীভবন রবিতীর্থ বিদ্যালয়ে কোন অনুষ্ঠান বা মিটিং হলে আমরা একসঙ্গে ফিরতাম। বাড়ির সামনে ফুল গাছগুলো দেখে ভালো লাগত। অনেক সময়ই তাঁর বাগান পরিচর্যা নিয়ে কথা হতো। বুঝতে পারতাম ঐ গাছগুলো ছিল তাঁর সন্তানসম। ভাবতে ভালো লাগে এই শ্রদ্ধেয় মানুষটির কত স্নেহ ভালবাসা পেয়েছি। তিনি একদিন বলছিলেন -- কিংশুক তুমি যে আমার কার্বন-কপি সেটা বুঝতে পেরেছ? আমি বললাম কীরকম? উনি বললেন --- আমি কল্যাণী পান্নালাল ইন্সটিটিউশন এ শিক্ষকতা করেছি তুমিও করেছ। তার আগে আমি দুটি স্কুলে শিক্ষকতা করেছি। স্কুলভিন্ন হলেও তুমিও পান্নালাল ইন্সটিটিউশন এর আগে দুটো স্কুলে শিক্ষকতা করেছ। দীর্ঘ সময় একটি সরকার পোষিত স্কুলের(আদর্শ শিক্ষায়তন) প্রধান শিক্ষক ছিলাম তুমিও দীর্ঘ সময় ঐরকম একটি স্কুলের (শান্তিপুর মিউনিসিপাল স্কুল) প্রধান শিক্ষকের দায়িত্ব পালন করে এসেছ। আমি রবিতীর্থ সোসাইটির সভাপতি ছিলাম। পরে তুমিও সেই পদে বহাল হলে। রিটায়ারমেন্টের পর আমি এই বেদীভবন রবিতীর্থ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষকের দায়িত্ব নিলাম। তোমাকেও কিন্তু সেই দায়িত্বই নিতে হলো।

নরেশ বাবু নিয়মিত লেখালেখি করতেন। তাঁর প্রথম প্রকাশিত গ্রন্থ 'আমার চোখে ইউরোপ'। এরপর আরও দুটি ভ্রমণ কাহিনি মূলক গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে তবে তাঁর শেষ গ্রন্থ আত্মজীবনীমূলক লেখা 'পুরান দিনের কথা' পড়ে আমি অভিভূত। সেই বই পড়ে এতদিন পর জানলাম পঞ্চাশের দশকে তিনি ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হয়েছিলেন।

১৮ জানুয়ারি ২০২৫ সকাল বেলা শ্রদ্ধেয়া বৌদির ফোন পেলাম। স্যার অসুস্থ নার্সিং হোমে নিয়ে যেতে হবে। কালবিলম্ব না করে নার্সিং হোমে যোগাযোগ করলাম। নার্সিং হোমের গেট দাঁড়িয়ে আছি।

অল্প সময়ের মধ্যেই অধৈর্য হয়ে পাইচারি করছি।

পাড়ার থেকে খুব তৎপরতার সঙ্গে নার্সিং হোমে পৌঁছে গেল। ওদের চোখ মুখের ঈঙ্গিত আমাকে বিধ্বস্ত করল। উপলব্ধি করলাম নার্সিং হোমের প্রয়োজন ফুরিয়েছে। অতি নিকট আত্মীয় হারিয়ে আমি বাকরুদ্ধ।

অবশেষে তাঁর অন্তিম যাত্রায় শেষ প্রণতি জানাতে বেদীভবন রবিতীর্থ বিদ্যালয় অঙ্গন জনাকীর্ণ। আমি সেই ভিড়ের মধ্যে দাঁড়িয়ে আছি তবু খুব একা লাগছিল।

"শ্রদ্ধেয় স্যার-এর প্রতি"

বাসুদেব দাম, শিক্ষক

১৮ জানুয়ারী, ২০২৫, শনিবার প্রয়াত হলেন নরেশচন্দ্র কংসবনিক মহাশয়। প্রয়াণ কালে তার বয়স হয়েছিল ৮৪ বছর। নরেশ চন্দ্র কংসবনিক বাংলাদেশের চট্টগ্রাম জেলার টেরিটি বাজারে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর জন্ম ১৯৪০ সালের ১৭এপ্রিল (৩ রা বৈশাখ)। বিদ্যালয়ের শংসাপত্র অনুযায়ী কংসবনিক ১ মে ১৯৪০ সাল। বাবা গঙ্গাচরণ কংসরনিক, মা প্রেমদা কংসবনিক। তাঁদের ছয় পুত্রের মধ্যে পঞ্চম জন ছিলেন নরেশ চন্দ্র কংসবনিক। তাঁরা ছয় ভাই ও চার বোন ছিলেন। ভাই-রা হলেন উমেশচন্দ্র কংসবনিক, লক্ষ্মণ কংসবনিক, রণেন্দ্র চন্দ্র কংসবনিক, রমেশ কংসবনিক, নরেশ চন্দ্র কংসবনিক, সুরঞ্জন কংসবনিক। বোনেরা হলেন পুষ্পরাণী কংসবনিক, শিশুবালা কংসবনিক, প্রবাসী কংসবনিক, মল্লিকা কংসবনিক। নরেশচন্দ্র কংসবনিক মহাশয়ের সহধর্মিনী হলেন শ্রীমতী মমতা কংসবনিক। তাদের এক পুত্র রাজর্ষি কংসবনিক এবং একমাত্র কন্যা মানিনী কংসবনিক।

১৯৪৮ সালের ২৯ শে জানুয়ারী ৮ বছর বয়সে পূর্ববঙ্গ (অধুনা বাংলাদেশ) থেকে আসামে মামার বাড়িতে চলে আসেন। একটি আট বছরের ছেলের মাথায় কী করে তারিখটা মনে থাকলো! এটাও বিস্ময়ের কারণ ঠিক তার পরের দিন ৩০ জানুয়ারী নাথুরাম গডসে-এর হাতে গান্ধীজী নিহত হয়েছিলেন। যে সংবাদ সর্বত্র উল্কার বেগের মতো ছড়িয়ে পড়েছিল। তাঁর মামা ছিলেন টংনা 'টি' এস্টেটের বড় কেরানী।

পূর্ববঙ্গ থেকে আসামে মামার বাড়িতে আসার পর তিনটি বিদ্যালয়ে পড়াশুনা করেছিলেন। উল্লেখ্য যে, তিনি তিনবার ডবল প্রমোশন পান। তিনি চা বাগানের প্রাথমিক বিদ্যালয়ে চতুর্থ শ্রেণি পর্যন্ত পড়েছিলেন। এরপর শিলচরের একটি বিদ্যালয়ে সরাসারি ষষ্ঠ শ্রেণিতে ভর্তি হয়েছিলেন। পুনরায় তিনি সপ্তম শ্রেণিতে তিনসুকিয়া বঙ্গীয় বিদ্যালয়ে ভর্তি হন। পরবর্তী সময়ে কটন কলেজে ভর্তি হন। শতাব্দী প্রাচীন কোলকাতার সেন্ট পলস্ কলেজে অর্থনীতিতে অনার্স নিয়ে ভর্তি হন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে স্নাতকোত্তরে পড়াশুনা শুরু করেন। কিন্তু ফাইনাল পরীক্ষা শেষ হবার আগেই তিনি কর্মজীবনে প্রবেশ করেন।

নদীয়ার বড়জাগুলীর গোপাল অ্যাকাডেমীতে প্রথম শিক্ষকতার কাজে যোগ দেন তিনি। এই বিদ্যালয়ে এক বছর তিন মাসের শিক্ষকতার পর ১৯৬৪ সালের ২৯ ফেব্রুয়ারী প্রথম শিক্ষকতার কাজ থেকে অবসর নেন। এরপর বেথুয়াডহরীর জে. সি. এম. হাই স্কুলে দশমাসের জন্য শিক্ষকতা করেন।

পরবর্তীতে ১৩ ফেব্রুয়ারী, ১৯৬৫, কল্যাণী পান্নালাল ইনস্টিটিউশনে সহ শিক্ষক পদে যোগ দেন। ১৯৭১ সাল পর্যন্ত পান্নালাল ইনস্টিটিউশনের শিক্ষক জীবন ছিল একেবারে মুক্ত বিহঙ্গের মত। ১৯৭১ সালেই তাঁর জীবনে মোড় ঘোরানোর জন্য আরেকটি ঘটনা ঘটলো। একটি রেকগনাইজড লাম্প গ্রান্ট স্কুলে প্রধান শিক্ষকের দায়িত্ব পালন করতে হবে। লাম্প গ্রান্ট অনেকদিন বাদে বাদে পাওয়া যায় জেনেও সামাজিক দায়বদ্ধতার কথা বিবেচনা করে কাটাগঞ্জ গোকুলপুর আদর্শ শিক্ষায়তনে ১৯৭১ সালের ৬ জুলাই প্রধান শিক্ষক হিসাবে যোগদান করেন। এই বিদ্যালয়েই কর্মজীবনের শেষ দিন পর্যন্ত অতিবাহিত করেন। ২০০০ সালের ৩০ এপ্রিল তিনি অবসর গ্রহণ করেন। একজন পরিপূর্ণ শিক্ষক তথা আদর্শ শিক্ষক হিসাবে সর্বজন শ্রদ্ধেয় হয়ে উঠেছিলেন। প্রধান শিক্ষকের দায়িত্ব সামলানোর পাশাপাশি তাঁর উপর ন্যস্ত হলো গয়েশপুর নোটিফায়েড এরিয়া অথরিটিতে শেষ চেয়ারম্যানের দায়িত্ব। সময়কাল ছিল ০১-১২-১৯৯৩ থেকে ৩০-০৫-১৯৯৫। গয়েশপুর পৌরসভার প্রথম নির্বাচিত পৌর প্রধান হিসেবে ২৭-০৬-১৯৯৫ তারিখে কার্যভার গ্রহণ করেন। পৌর প্রশাসক হিসেবে যথেষ্ট দক্ষতার পরিচয় দেন তিনি। পৌর প্রধানের কার্যকাল শেষ হয় ২২-০৬-২০০০ তারিখে। এরপর বেদীভবন রবিতীর্থ বিদ্যালয়ে ২০০৭ সালের ১ মে প্রধান শিক্ষক হিসেবে যোগ দেন। বিদ্যালয়ের সামগ্রিক শ্রীবৃদ্ধিতে তাঁর ভূমিকা ছিল অনস্বীকার্য। ৩১ ডিসেম্বর ২০১৩ তারিখে বেদীভবন রবিতীর্থ বিদ্যালয় থেকে প্রধান শিক্ষক হিসেবে অবসর গ্রহণ করেন।

তিনি ছিলেন একজন প্রকৃত শিক্ষাবিদ। তাঁর কথার সারমর্ম হলো "শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে প্রথাগত শিক্ষার বাইরে সামাজিক মিলন ও উৎকর্ষ কেন্দ্র হিসাবে গড়ে তুলতে হবে"। এক জন আদর্শ শিক্ষকের যে সকল গুণগুলো থাকা দরকার তার সবকয়টিই তার মধ্যে ছিল।

প্রধান শিক্ষক বলে ছোটোবেলা থেকে যাঁকে চিনি বা জানি তিনি হলেন আমাদের পরমপ্রিয় শ্রদ্ধেয় শিক্ষক নরেশচন্দ্র কংসবনিক মহাশয়। কাটাগঞ্জ গোকুলপুর আদর্শ শিক্ষায়তনে প্রধান শিক্ষকের পদে যোগদান করার পর এলাকার জনমানসে এবং ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে সুদূর প্রসারী প্রভাব ফেলেছিলেন। তিনি অর্থনীতির ছাত্র ছিলেন। বিদ্যালয়ে নবম ও দশম শ্রেণিতে মূলত ইংরেজী পড়াতেন। অসাধারণ দক্ষতায় তাঁর ক্লাস নেবার ধরণ সকলকে মুগ্ধ করত। বিদ্যালয়ে শৃঙ্খলা রূপায়নে তাঁর ভূমিকা ছিল অনস্বীকার্য।

আমি পঞ্চম শ্রেণি থেকে দশম শ্রেণি পর্যন্ত কাটাগঞ্জ গোকুলপুর আদর্শ শিক্ষায়তন (উ.মা.)-এ পড়াশুনা করেছি। তখন বিদ্যালয় মাধ্যমিক বিভাগ পর্যন্ত ছিল। শৃঙ্খলাবোধ, শ্রদ্ধাশীল হওয়ার শিক্ষা যাঁর কাছ থেকে কিছুটা হলেও নিজের মননে আয়ত্ত করতে পেরেছি তিনি হলেন পরমশ্রদ্ধেয় প্রধান শিক্ষক নরেশচন্দ্র কংসবনিক মহাশয়। পঠন-পাঠন চলাকালীন সময়ে বিদ্যালয়ের করিডরে তাঁর নিয়মিত পদচারণা শৃঙ্খলার অন্যতম নিদর্শনকে প্রকাশ করতো। ২৩ জানুয়ারী, ২৬ জানুয়ারী, ১৫ আগষ্ট পালনীয় দিনগুলিতে আমাদের ছাত্র-ছাত্রীদের উদ্দেশ্যে দিবসের তাৎপর্য ব্যাখ্যা নির্দিষ্ট

মাত্রা যোগ করতো। খুব সহজ-সরল ছিল তার বক্তব্য পরিবেশনা। সব সময় সাদা পোশাক পরিধানের মধ্য দিয়ে তার ব্যক্তিত্বের প্রকাশ প্রস্ফুটিত হতো। তাঁর ইংরেজী পড়ানোর কৌশল ছিল অনবদ্য। সমীহ, ভয়, শ্রদ্ধার সংমিশ্রণ হলো শ্রদ্ধা মিশ্রিত ভয় (awe), যা আমাদের পরবর্তী জীবনে চরিত্র গঠনে অনেকটাই সাহায্য করেছে।

ভ্রমণ পিপাসু মানুষ ভারতবর্ষের প্রায় সম্পূর্ণ অংশ ভ্রমণের পাশাপাশি বিদেশ বিশেষ করে ইউরোপের বিভিন্ন দেশ, আফ্রিকার বিভিন্ন দেশ পরিভ্রমণ করেন। ভ্রমণের নির্যাস তাঁর লেখনীর মাধ্যমে সুন্দর ও সুচারু দক্ষাতায় প্রকাশ করতেন। তিনি লিখেছেন অসংখ্য ভ্রমণ বিষয়ে কাহিনী ও প্রবন্ধ। বেদীভবন রবিতীর্থ বিদ্যালয়ের 'ব্রতী' পত্রিকায় নিয়মিত তাঁর লেখা প্রকাশিত হয়েছে। ভ্রমণ বিষয়ে প্রকৃতিকে সঙ্গে রেখে তাঁর অনায়াস সৃষ্টি 'এ যুগের কিশোর বিজ্ঞানী' পত্রিকায় তা অনন্য ছাপ রেখেছে। কোলকাতা প্রকৃতি পরিব্রাজক সমিতির প্রকাশনায় 'মনপবন' পত্রিকায় ভ্রমণ প্রসঙ্গে সৃজন যথেষ্ট সমাদৃত হয়েছে। রবিতীর্থ গ্রন্থন বিভাগের প্রকাশনায় তাঁর লেখা যথাক্রমে 'আমার চোখে ইউরোপ' এবং 'আমার চোখে আমার দেশ' বই দুটি সকলের কাছে গ্রহণযোগ্য ও প্রশংসিত হয়। তাঁর প্রিয় ছাত্র-ছাত্রীদের উদ্দেশ্যে সর্বশেষ গ্রন্থমালা 'পুরানো দিনের কথা' উৎসর্গ করেন। বইটির সম্পাদনার কাজে অরুণ দত্ত, বাসুদেব দাম, দীপঙ্কর ব্যানার্জী, সৌরভ সাহা সহায়তা করেন। জন বিজ্ঞান আন্দোলনে তাঁর ভূমিকা ছিল অনবদ্য। পশ্চিমবঙ্গ বিজ্ঞান মঞ্চের কর্মী হিসাবে যে দুজন মানুষের সহচর্যে আমার যুক্ত হওয়া তাঁদের মধ্যে অন্যতম হলেন নরেশ চন্দ্র কংসবনিক মহাশয়। অন্যজন হলেন বেদীভবন রবিতীর্থ বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ শ্রদ্ধেয় মধুসুদন চক্রবর্তী মহাশয়। জেলা কমিটির প্রথম কোষাধ্যক্ষ, পরবর্তী সময়ে জেলার সহ সভাপতি, জেলা কাউন্সিল সদস্য, সর্বোপরি রাজ্য কাউন্সিল সদস্য হিসেবে তাঁর ভূমিকা ছিল উল্লেখ করার মতো। নদীয়া জেলার বেদীভবন রবিতীর্থ বিদ্যালয়ে সর্বপ্রথম জেলা শিশু বিজ্ঞান উৎসব (১৯৯২ সাল) অনুষ্ঠিত হয়। সেক্ষেত্রে নরেশ চন্দ্র কংসবনিক ও মধুসুদন চক্রবর্তী মহাশয় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছিলেন। গয়েশপুর অঞ্চলে ধারাবাহিকভাবে 'শিশু বিজ্ঞান উৎসব' রূপায়ণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছিলেন। ৮৪ বছরেরও বেশি সময় তিনি বেঁচেছিলেন। জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত শারীরিক কসরৎ- এর পাশাপাশি তাঁর অত্যন্ত সখের নিয়মিত বাগান চর্চা করে গেছেন। সু-খাদ্যাভাস, পরিমিত আহার গ্রহণ, শারীরিক শৃঙ্খলাপরায়নতার জন্য তাঁর কর্ম তৎপরতায় কোনো ছেদ পরে নি। তিনি প্রকৃত অর্থেই সকলের কাছে আদর্শ হতে পেরেছেন তার নিজ কর্মধারা ও গুণের মাধ্যমে। তিনি চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবেন সকলের কাছে। অনেক কিছুই বাকী থেকে গেলো। না বলা বা না লেখা কথাগুলো কোনো সময় সুযোগ পেলে আবার লিখব। শ্রদ্ধেয় স্যারকে প্রণাম জানাই।

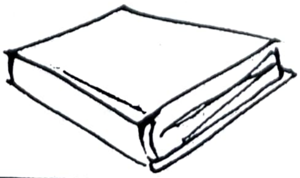

আমার স্মৃতিতে কাকু

আশুতোষ কংসবনিক

দিনটা ছিল বৃহস্পতিবার ২০শে মার্চ, ২০২৫। দীপঙ্কর স্যার আমার কাছে এসে বললেন যে ব্রতী'র আগামী সংখ্যা বের হবে আমার কাকু নরেশ চন্দ্র কংসবনিক এর স্মরণে। তাই রাজর্ষি, মানিনীকে বলতে কিছু লেখা দেওয়ার জন্য। সঙ্গে আমিও যেন একটা লেখা দিই। আমি তখনই মনে মনে ঠিক করে নিই আমার অনভিজ্ঞ ও অপটু হাতে কিছু লিখব। কিন্তু কী লিখব! কত কথাই তো মনে আসছে এলোমেলো ভাবে।

কাকুর স্মৃতিতে লিখতে গিয়ে প্রথমেই জানাই, আমি আজ জীবনের সে জায়গায় আছি তার সবটাই কাকুর জন্য। কাকুর জন্যই আমাদের কাটাগঞ্জে স্থায়ীভাবে আসা এবং প্রতিষ্ঠা পাওয়া। এখানে আমার সবচেয়ে বড় পাওয়া যেটা... সেটা হল 'রবিতীর্থ' পরিবারের সদস্য হতে পারা। এখানে এসেই আমি আমার জুনিয়র, সিনিয়র ও প্রায় সমবয়সী সহকর্মীদের পাশে পেয়েছি। সর্বোপরি পেয়েছি অগুনতি ছাত্রছাত্রীকে।

বাবা ছিলেন কাকুদের সবচেয়ে বড় ভাই, তাই ছোটবেলা থেকেই বাবাকে দেখেছি আমাদের পরিবারের সকলকে নিয়ে এগিয়ে যেতে। বাবা কাজ করতেন আসামের এক প্রত্যন্ত চা বাগানে। সেখানে ছিল না কোন পড়াশুনার সুযোগ। তাই ছোটবেলা থেকেই কাকু-পিসিদের কাছে বড় হয়েছি। বছরে দুবার বড় ছুটিতে (পুজোর ছুটি ও গরমের ছুটি) বাবা-মা-র কাছে চলে যেতাম। আমার এই কাকু যেহেতু স্কুলের শিক্ষক ছিলেন তাই ছুটিতে কাকুকে অনেক সময় কাছে পেতাম। তখন খুব আনন্দের সঙ্গে দিনগুলো কাটাতে পারতাম। ছোটবেলা থেকেই দেখেছি আমাদের পারিবারিক দৃঢ় বন্ধন । ১৯৮৬ সালে বাবা মনস্থির করলেন যে চা বাগানের চাকুরী ছেড়ে পশ্চিমবঙ্গে স্থায়ীভাবে চলে আসবেন। তখন কাকু ছিলেন 'কাটাগঞ্জ - গোকুলপুর আদর্শ শিক্ষায়তন'- এর প্রধান শিক্ষক। আমি অবশ্য সেই সময় থাকতাম কোলকাতায় আমার ছোট কাকুর কাছে। যাইহোক বাবা, কাকুকে কাটাগঞ্জে বাড়ী খোঁজার কথা বললেন। বাড়ী পাওয়া গেল। এইভাবেই আমাদের কাটাগঞ্জে আসা।

কাকুর স্মৃতিতে লিখতে গিয়ে আমাদের নিজেদের কথাও লিখে ফেললাম। ১৯৯২/৯৩ সালে আমি 'রবিতীর্থ'-র সদস্য হলাম। এখানে পরিচালন সমিতিতে কাকুকে দেখে জোর পেতাম মানসিক ভাবে।

স্কুলের বিভিন্ন অনুষ্ঠানে কাকুর বক্তব্য মনের মধ্যে গেঁথে থাকত। এত সহজভাবে কথা বলতেন।

তবে এভাবে হঠাৎ করে আমরা তাঁকে চিরকালের মত হারাবো ভাবতেই পারিনি। কাকুর অনেক আশা ছিল আমাদের এক পারিবারিক আনন্দানুষ্ঠানে থাকবেন এবং সকলের সঙ্গে আনন্দে যোগদান করবেন, সেই আশা আর পুরণ হল না। এটাই আক্ষেপ থেকে গেল আমাদের সকলের। তবে এই বাস্তবতাকে তো মেনে নিতেই হবে।

বাবা, রবিতীর্থ ও ব্রতী

রাজর্ষি কংসবনিক (পুত্র)

গত ১৮.০১.২০২৫ থেকে বাবা আর নেই। ১৯.০১.২০২৫ এ শেষ যাত্রায় সবচেয়ে ভালোভাবে মালা দেওয়ার অনুষ্ঠান 'বেদীভবন রবিতীর্থ বিদ্যালয়ে' হয়েছিল। ০২.০২.২০২৫ এ সরস্বতী পূজা উপলক্ষে বাবার ছবিসহ যে প্রদর্শনী হয়েছিল সেটাও বেশ ভাল লেগেছিল। আসলে, বাবার জীবনের শেষদিকে এই বিদ্যালয়ের সাথে জড়িয়ে পড়া বাবার এক অন্যতম শান্তির ও আনন্দের কারণ হয়েছিল। আমাদের দুই ভাইবোনের প্রথম বিদ্যালাভ শুরু হয়েছিল এই 'রবিতীর্থেই'।

আমি মাইনর টু-তে ১৯৮০ সালে ভর্তি হই ও আমার বোন মানিনী মাইনর ওয়ানে ১৯৮১ সালে 'রবিতীর্থে ভর্তি হয়।

তখন চতুর্থ শ্রেণি অবধি এই বিদ্যালয়ে পড়া যেত ও পঞ্চম শ্রেণি থেকে আমরা দুই ভাই বোন যথাক্রমে ১৯৮৫ ও ১৯৮৭ সালে 'কাটাগঞ্জ গোকুলপুর আদর্শ শিক্ষায়তন' বিদ্যালয়ে ভর্তি হই যেখানে বাবাকে 'প্রধান শিক্ষক' হিসাবে দেখতে পাই।

এর বাইরে পরবর্তীকালে উচ্চ বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রী থাকাকালীন আমরা দু'জন অঙ্কন, 'সঙ্গীত ও তবলাশিক্ষা পেয়েছি রবিতীর্থ বিদ্যালয়ে। আমাদের ওই সময়ের সহপাঠীদের মধ্যে এখন কেউ কেউ রবিতীর্থ বিদ্যালয়ের শিক্ষক-শিক্ষিকা হিসাবে বিদ্যালয়ের সাথে জড়িত আছে। পাশাপাশি এই মুহূর্তে এমন প্রচুর প্রাক্তন ছাত্র ছাত্রী আছে, যারা বর্তমানের ছাত্রছাত্রীদের অভিভাবক-অভিভাবিকা।

আমি যখন রবিতীর্থের ছাত্র ছিলাম, তখন 'কলরব' নামের দেওয়াল পত্রিকা বেরত। পরে ম্যাগাজিন আকারে ছাপা পত্রিকা 'ব্রতী' বেরনোর পিছনেও বাবার বড় অবদান আছে।

এই মুহূর্তে রবিতীর্থ বিদ্যালয়ের কল্যাণীতে শাখা রয়েছে ও বিদ্যালয়ে উচ্চ মাধ্যমিক স্তর পর্যন্ত শিক্ষাদানের ব্যবস্থা রয়েছে। রবিতীর্থ বিদ্যালয় বর্তমানে বেসরকারী বিদ্যালয়গুলোর মধ্যে যথেষ্ট উজ্জ্বলভাবে নিজের নাম প্রতিষ্ঠা করতে পেরেছে। এর পিছনে বিদ্যালয়ের সমস্ত শিক্ষক-শিক্ষিকা-শিক্ষাকর্মীর বিরাট অবদান রয়েছে। বাবা সবসময় 'মানব সম্পদ উন্নয়নে'র উপরে জোর দিতেন। তাই বিদ্যালয়ের শিক্ষকশিক্ষিকারা ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের মাধ্যমে যে মহান সুযোগ পেয়ে ভবিষ্যৎ প্রজন্ম ও সমাজকে গড়ে তোলার অংশ হতে পারেন, তাঁরা সেই জন্য নিজেদের ভাগ্যবান মনে করতে পারেন।

এবারের 'ব্রতী' সংখ্যা বাবাকে কেন্দ্র করে বেরোচ্ছে জানতে পেরে ভীষণ ভাল লাগছে।

ব্রতীতে স্বরচিত লেখা শুরু করে পরবর্তী জীবনে কবি বা লেখক হিসাবে প্রতিষ্ঠা পেয়েছে এরকম কারো কথা আমার জানা নেই। আমি আশা করবো অদূর ভবিষ্যতে এমন কবি-লেখক জনপ্রিয় হয়ে উঠবেন যাদের সাহিত্যচর্চার শুরু ব্রতী পত্রিকার মাধ্যমে হয়েছিল। ভবিষ্যৎ প্রজন্মের কথা ভেবে ব্রতীর সাফল্য কামনা করি।

আজকের দিনে দাঁড়িয়ে বাবার প্রত্যক্ষ সাহায্য ছাড়াও 'রবিতীর্থ' যদি উন্নতি করতে পারে সেটাই বাবার প্রতি বিদ্যালয়ের সকলের যথার্থ শ্রদ্ধাজ্ঞাপন হবে বলে মনে করি।

বাবা

মানিনী দাস (কংসবনিক)

আমি তখন আট কি নয়..., রবিতীর্থে পড়ি, বেড়াতে গেছি বেথুয়াডহরী। বাবা বলল 'জানিস্, এখানে তোদের রাঙাজেঠুর সাথে একটা কোয়ার্টারে থাকতাম, চল দেখিয়ে আনি।' গিয়ে কী দেখলাম? সেখানে ড্রয়িং হলে একদিকের দেওয়ালে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও অন্য আর এক দেওয়ালে কাজী নজরুলের পেন্সিল স্কেচ, বাবার হাতে আঁকা। ছবির বাউন্ডারির পারিপার্শ্বিক দেখলেই বোঝা যাচ্ছিল ঐ দেওয়ালগুলোতে বহুবার রঙের প্রলেপ পড়েছে কিন্তু বাবার শিল্পসত্ত্বাকে কেউ মুছে ফেলতে পারেনি। প্রথমবার জানলাম আমার বাবা একজন বড় মাপের আর্টিষ্ট।

বাবা কতটা সঙ্গীতানুরাগী ছিল? সেন্টপল্‌স কলেজের হস্টেলের পাঁচিল টপকে, সারা রাত জেগে বিখ্যাত সঙ্গীত শিল্পীদের জলসা উপভোগ করেছিল, আর ধরাও পড়েছিল।

বাবার দুটো গীটার ছিল। বাবা যখন কল্যাণীতে থাকত তখন ইলেকট্রিক গীটার বাজিয়ে অনুষ্ঠান জমিয়ে দিত শুনেছি। আমাদের বায়নাতে দাদাকে আর আমাকে বাবা গীটারে সারেগামা... শিখিয়েছিল, আর একটা গানও তুলিয়েছিল 'তোরা যে যা বলিস ভাই/ আমার সোনার হরিণ চাই...।'

আর একটা মজার কথা সবার সঙ্গে শেয়ার করি,- বাবা একবার আমাকে জিজ্ঞাসা করেছিল, "হ্যাঁ রে, আমি যখন বক্তৃতা দিই তোর কী রকম অনুভূতি হয়?"

আমি বলেছিলাম 'আমার খুব টেনসন হয়, যদি তুমি ভুলে যাও।' বাবা হাহা করে হেসে বলেছিল, "আমি কি তোর মত মুখস্থ করে বলি যে ভুলে যাবো? প্রথমে মনে মনে ছক কষে নিই কী কী বিষয় নিয়ে বলব, তারপর যখন বলতে শুরু করি তখন শব্দরা দিব্যি বাক্য হয়ে বেরিয়ে আসে; বাগ্‌দেবী স্বয়ং আমার সহায় বুঝলি?"

বাবার ভ্রমণ বিলাসিতার কথা কে না জানে? কিন্তু রবিতীর্থ যদি বাবার ভ্রমণ কাহিনী পুস্তকাকারে না ছাপাতো বা বাবাকে লিখতে উদ্বুদ্ধ না করত, বাবার লেখক পরিচিতি কীভাবে হত? আমার তো সর্বদা মনে হয় রবিতীর্থ বাবার 'স্বপ্নপূরণ কেন্দ্র'।

বাবাতো খুব রসিক ছিল, একদিন আমাকে ফোন করে বলল "এতদিন আমি শিক্ষক ছিলাম, আজ ছাত্র হয়ে গেলাম, তাও নাতির (শুভম কংসবনিক) কাছে। আজ শুভম এসে আমাকে মোবাইলে কত কী শেখালো। শেখার কোনো শেষ নেই বুঝলি?" এই বয়সেও বাবা সুদোকু শিখে রোজ পেপার এলেই সমাধান করতে বসত, সাথে শব্দকোষ পুরণ করা তো ছিলই।

বাবাকে ছোটো বেলায় আমি জ্যান্ত ডিকশনারি ভাবতাম। ইংলিশ ওয়ার্ড মিনিং জানতে ভুলেও ডিকশনারি খুলতামনা, এমন তো কতবার হয়েছে বাবা হয়তো বাড়িতে নেই, বাবা ফিরে আসতে আসতে কী ওয়ার্ডের মানে জানব, সেটাই ভুলে গেছি।

বাবার একটা অন্যতম গুণ ছিল, বাবার যা পছন্দ হত সেটা শুধু দেখেই ছেড়ে দিত না, কার্যকরী করেই ছাড়ত। আমার ছেলে নীল (ভীষণ দাদু ভক্ত নাতি), যখন নয়ডাতে অষ্টম শ্রেণিতে ভর্তি হয়, বাবা ওদের স্কুলের রিসেপসন হলে দুটো বোর্ডে, দশম ও দ্বাদশ শ্রেণীর, স্কুলের বোর্ড টপারদের নাম লেখা দেখে বেশ অনুপ্রাণিত হয়েছিল। নীলকে বলেছিল, 'নীল, ঐ বোর্ডে তোর নাম থাকলে কেমন হয়?' বাবা সত্যি সত্যিই আমাদের ফাঁকিবাজ ছেলেটার মনে স্বপ্নটা বপন করে দিয়েছিল। নীলের নাম যখন দ্বাদশ শ্রেণিতে বোর্ডে যুক্ত হয়েছিল বাবা যে কী খুশি হয়েছিল. . !

বাবা আমাকে রবিতীর্থের জন্য ওর প্রাইজের কাপের নীচের লেখাটা ও বোর্ডের ছবি তুলে পাঠাতে বলেছিল। রবিতীর্থ একই প্রকার ব্যবস্থা ও পুরস্কার চালু করে বাবার ইচ্ছাকে মর্যাদার সাথে পালন করে চলেছে। সাধে রবিতীর্থকে আমি বাবার 'স্বপ্নপূরণ কেন্দ্র' ভাবি?

বাবা তো শুধু শিক্ষাক্ষেত্রেই নয়; বিজ্ঞান, শিল্প, খেলাধুলা, প্রশাসন আরও বিভিন্ন বিষয়ে দক্ষতার সাথে, সৎ ভাবে, মাথা উঁচু করে কাজ করে যাওয়ার উদাহরণ সৃষ্টি করে গেছে। এক এক জন ছাত্রছাত্রীকে নিজের সন্তানের মতো দেখত বাবা, তাদের সাফল্যে বাবার গর্বে বুক ফুলে উঠত। এমনকি আমাদের বাগানের গাছ গুলোও ছিল বাবার সন্তানস্নেহধন্য। আমি খুবই ভাগ্যবতী যে আমার বাবার মতো বাবা পেয়েছি।

আজ আমাদের মধ্যে বাবা নেই। সত্যিই কি নেই? আছে, আমি জানি আছে। কোথায়? আমাদের সবার মনের মধ্যে বাবা অমর হয়ে আছে, থাকবে....।

A silent promise

-Neelsayar Das

(Grandson of

Naresh Ch. Kangshabanik)

The society told him not to cry,
As he hoped it was a lie.
For it was not a moment of bliss,
Because it pronounced the death of a loved one whom he missed.

He gasped at the sight of airport,
Cause it was a moment of luxury, for a middle class.
Tears involuntarily fell from his eyes,
As he mourned the destination of his flight.

Kolkata was called the city of joy,
And it remained true to its name.
But, the name felt inappropriate for the youth,
As he processed the bitter truth.
Those lively lips of his grandfather,
Which read stories of his adventures in the foreign.
The youth hoped the lips would move for one last time,
Alas, life was cruel as he went down the memory lane.

The youth had an inappropriate chuckle,
As he reminisced many bittersweet memories.
He looked around the house where every object once beloved,
Now served as a haughty echo of the bonds they represented.

His eyes fell on a rolling chair,
Which was once the centre of a tug of war between him and his cousin.
But now the man who used to sit on it,
Is replaced by his portrait.

He recalled a small child snuggled on the lap of his grandfather,

As the aged man read another story of his tours.

Even though the grandfather's voice cracked from age,

He cannot betray the excitement of his curious lineage.

He went to the garden and saw a cactus and a small orange tree,

He shuddered as his left hand twitched.

His body recalled the cactus needles once stuck on his palm,

But his mind recalled his grandfather eating the sour oranges.

He had a small sad smile,

Those oranges were too sour to be eaten.

Hence, his 10 year old self made his grandfather eat those as a punishment,

Because he fell on the cactus on his grandfather's negligence.

The storage space felt empty,

Once hosting a cycle.

The cycle which carried the youth's childhood,

Powered by his grandfather's weary legs.

The sparkling ring on his finger,

Made his heart linger,

As he made a silent promise,

On his grandfather's wedding ring.

Tears welled up in his eyes as he remembered the unfulfilled promises,

Another board game, visit to other countries and another biryani together.

A silent promise to fulfill his grandfather's unfulfilled promise,

A promise to carry on his grandfather's heartwarming legacy.

প্রাক্তন ছাত্র ডঃ শান্তনু মজুমদারের (অধ্যাপক ও গবেষক, U.K) সঙ্গে আলাপচারিতায়

বর্তমান ছাত্রছাত্রীরা, শিক্ষক-শিক্ষিকা এবং অভিভাবক-অভিভাবিকা

কৌস্তভ সরকার (ছাত্র): তুমি কী বিষয় গবেষণা করো?

শান্তনু দা: আমার গবেষণার বিষয় হচ্ছে রসায়ন (Chemistry)। রসায়নের যে বিশেষ বিভাগ দুটি নিয়ে আমি গবেষণা করি তা হল পরিবেশ রসায়ন (Environmental Chemistry) এবং বিশ্লেষণাত্মক রসায়ন(Analytical Chemistry) ও আর ইদানিং গত ৩-৪ বছর ধরে আমি আর আমার Group, আরেকটা দিকে নজর রাখি সেটা হল Forensic Chemistry| অর্থাৎ বিভিন্ন যে Forensic কাজকর্ম হয় যেমন Fingerprint দেখা, এছাড়া যে সমস্ত বেআইনি ড্রাগস্, যেগুলো কিনা সারা বিশ্বে smuggle হয় সেগুলিকে analyse করি, UK Police -এর সাথে কাজ করে। Recently Cancer সংক্রান্ত কিছু কাজ করছি। আমাদের পরিবেশে অর্থাৎ জল, মাটি, বাতাসে প্রচুর রাসায়নিক পদার্থ থাকে। কিছু রাসায়নিক পদার্থ প্রাকৃতিক ভাবে পরিবেশে থাকে যেগুলোকে বলে (Natural Chemical) এবং কিছু রাসায়নিক পদার্থ আমাদের কল্যাণে বা অকল্যাণের কারণে পরিবেশে মিশছে যেগুলোকে বলে Anthropogenic Chemicals| তাই দুটি নিয়ে কাজ করি এবং আগেও এবং বর্তমানেও আর্সেনিক নিয়ে গবেষণা চালাচ্ছি। কিন্তু এখন আমি মূলত পরিবেশের যে রাসায়নিক নিয়ে কাজ করছি সেগুলোকে বলা হয় 'Emerging Eminent, অর্থাৎ যে রাসায়নিক পদার্থগুলো এখন প্রচুর পরিমানে আসছে। এবং এই রাসায়নিক পদার্থগুলি আমাদের স্বাস্থ্যের জন্য সর্বোপরি পরিবেশের স্বাস্থ্যের জন্য প্রচণ্ড ক্ষতিকারক। প্লাস্টিক ভেঙে যে Micro এবং Nano Plastic তৈরি হয় সেগুলো মানব দেহের বিভিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের সঙ্গে সহজে মিশি যায়। আমরা দোকানে যাই কোনো প্রেসক্রিপশন ছাড়াই ওষুধ নিয়ে আসি, নিয়ে কিছুটা ওষুধ খাই আর বাকিটা ফেলে দিচ্ছি। এছাড়াও বিভিন্ন cosmetic Product এগুলিই হচ্ছে পরবর্তী পরিবেশ দূষক। এগুলো প্রকৃতির ভীষণ রকম ক্ষতি করে। আমি এগুলো নিয়েই পড়াশোনা করি গবেষণা চালাই।

কৃষ্টি (শিক্ষার্থী): মানুষ কি সত্যিই পরিবেশ সম্পর্কে সচেতন? মানে বর্তমানে জনসচেতনতা কোন পর্যায়?

শান্তনুদা: ডঃএ.পি.জে. আবদুল কালামের একটা বিখ্যাত উক্তি আছে যা কিছু আমরা বিনামূল্যে পাই সেগুলিকেই আমরা বেশি করে ক্ষতি করি। এই জন্যই আমরা জল, মাটি, বায়ুকে বেশি করে দূষিত করি। জনসচেতনতা বিষয়টা স্কুল স্তর থেকেই শুরু করতে হবে। এজন্য শিক্ষানীতিটাকেই সেরকম হতে হবে। আমার এরকমও একটা ঘটনা জানা আছে যে একজন একটা গাছ কেটেছে তার পরিবর্তে ২০টি গাছ লাগিয়েছে, কিন্তু তার মধ্যে একটা

গাছও সেই অঞ্চলের উপযুক্ত নয়। উল্টে ওই গাছগুলো এতটাই জল শোষণ করল যে ওই এলাকার ভূমধ্যস্থ জলস্তরটাই নেমে গেল।

শেখর স্যারঃ পার্থেনিয়াম গাছ কতটা ক্ষতিকারক? নির্মূল করার উপায় কী?

শান্তনু দাঃ পার্থেনিয়াম অবশ্যই ক্ষতিকর। পার্থেনিয়ামের পরাগটা আমাদের জন্য প্রচণ্ড ক্ষতি কারক। নির্মূল করতে গেলে অবশ্যই এর পরাগের বিস্তৃতিটাকে কমাতে হবে। অবশ্যই আঞ্চলিক যেসমস্ত গাছ আছে তার পরিমাণ বাড়াতে হবে।

সৌরভ স্যারঃ তোমার পড়াশোনার ধাপগুলো যদি একটু বলো। আর বিদেশ যাবার প্রয়োজন হল কেন?

শান্তনু দাঃ Class IV পর্যন্ত রবিতীর্থে পড়ি, কাঁচরাপাড়া হার্নেট হাইস্কুল থেকে মাধ্যমিক এবং উচ্চমাধ্যমিক পাশ করি। তারপর চাকদা কলেজে Chemistry Honours নিয়ে ভর্তি হই। Kalyani University থেকে Masters করি। Master করার সময় একটা Thesis জমা দিতে হয়। Masters করার সময় একটা বহুজাতিক সংস্থায় চাকরি পাই কিন্তু চাকরিটা আমি মাত্র ৩ মাস করি। তো আমার Thesis টা ছিল আর্সেনিক বিষয়ে, এজন্য বহু প্রত্যন্ত এলাকায় 'যেতে হয়েছে Sample collect করতে যেমন- দেবগ্রাম, তেহট্ট, মুর্শিদাবাদ, বারইপুর। একদিন বনমালিপুরে আমি দেখি জুলাই মাসের কড়া রোদে একজন মহিলার কোলে ২টি শিশু আর মাথায় পাঁচটা হাঁড়ি। পরে আমি জানতে পারি শুধুমাত্র একদিনের জল আনার জন্যে তাকে 3km হেঁটে যেতে হয় আর ফিরতে হয়। সেই ছবিটাই আমার মাথায় ঘুরত। আমি তখনই ঠিক করি আমি চাকরিটা ছেড়ে দেব। আমি গবেষণা করতে গিয়ে জানতে পারি আমি এদেশের জন্যে যে কাজটা করতে চাইছি সেটা এখানে থেকে করা সম্ভব হবে না। গবেষণার জন্য দুটি যন্ত্রের প্রয়োজন যে যন্ত্রগুলি তখন এদেশে ছিল না এমনকি এখনও এদেশে আসেনি। তখন আমি German Fellowship -এর জন্য চেষ্টা করি। প্রথম বার প্রচন্ড Preparation নিয়ে গিয়ে Fail করি দ্বিতীয়বার Without Preparation আমি পাই। আমি Germany-তে যাই গিয়ে বুঝি STEM-এ মহিলাদের ভূমিকা কী? বিদেশে যে Dignity যে শিক্ষা আছে সেটা এই দেশে নেই। আজও যখন Recently আমি এত বড়ো বড়ো Instituted-এ ঘুরলাম Scholar দের সাথে দেখা করলাম এই অভিযোগটা রয়ে গেছে যে তাঁদের যথাযোগ্য সম্মান প্রদানে খামতি আছে। তারপর আমি এখন বর্তমানে Bournemouth University -তে অধ্যাপনা করছি। আমি এটা মনে করি যে দেশের জন্য কাজ করতে হলে সেটা বাইরে থেকেও করতে পারব।

অভিভাবকঃ দেশীয় ভাষায় শিক্ষা লাভ করার পর আপনি উচ্চ শিক্ষার ক্ষেত্রে কোনো সমস্যার সম্মুখীন হয়েছেন।

শান্তনু দাঃ বিভিন্ন ভাষা জানা একটা skill। অবশ্যই বিভিন্ন ভাষা জানা ভালো। তবে হ্যাঁ

বাংলা ভাষায় শিক্ষালাভের পর উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে আমি কোনোরকম কোনো সমস্যার সম্মুখীন হইনি।

প্রঃ-আমরা তো দেখছি এখন বাঙালিদের মধ্যে তাদের সন্তানকে ইংরেজি মাধ্যম স্কুলে পড়াবার একটা ঝোঁক। আপনি নিজে বাংলামাধ্যম স্কুলে পড়াশোনা করেছেন, আপনার এ বিষয়ে অভিমত কী?

উঃ-বিজ্ঞান হোক আর যে কোনো বিষয় চর্চার জন্যেই মাতৃভাষার অবদান অনস্বীকার্য। সারা বিশ্বে এমন কোনও দেশ নেই যেখানে মাতৃভাষা ছাড়া অন্য কোনো ভাষায় স্কুলশিক্ষা দেওয়া হয়। সেটা যদি আমেরিকা, ইংল্যান্ড, কানাডার মতো দেশ হয় সেখানে মাতৃভাষা ইংরেজি তাই সেখানে ইংরেজিতে শিক্ষা দেওয়া হয়। যদি সেটা ইংরেজি ভাষা নয় এমন কোনো দেশ হয় সেখানে কিন্তু স্কুল শিক্ষা ব্যবস্থা কখনই ইংরেজিতে বা অন্য কোন ভাষায় হয় না, স্থানীয় মাতৃভাষায় হয়। আমি স্পেন, জার্মানিতে দেখেছি, লাতিন আমেরিকায় বেশ কিছু সময় কাটিয়েছি সেখানেও মাতৃভাষায় স্কুল শিক্ষা দেওয়া হয়। আমি এটার ভীষণরকম ওকালতি করি। অন্তত পক্ষে স্কুল শিক্ষা ব্যবস্থা সেটা প্রাথমিক হোক, মাধ্যমিক হোক, উচ্চ মাধ্যমিক হোক সেটা অবশ্য অবশ্যই মাতৃভাষায় হওয়া জরুরি। সুতরাং রবিতীর্থ সেখানে একটা ভীষণ রকম বিরল ব্যতিক্রমী এবং উজ্জ্বলতম উদাহরণ যেখানে মাতৃভাষাতে সমস্ত রকম বিষয়ের চর্চা শুধু হচ্ছে তা নয়, প্রায়োগিক পদ্ধতিতে সেই চর্চা হচ্ছে, সুতরাং আবারো বলবো তোমাদের গর্ব হওয়া উচিত যে তোমরা রবিতীর্থের শিক্ষার্থী এবং শিক্ষক শিক্ষিকাদের এর জন্য স্বীকৃতিও প্রাপ্য। আমি যেখানেই যাই এই বিষয়ে জোর দিই, তর্ক করি, লড়ে যাই। আমি নিজেও একটি বাংলা মিডিয়াম স্কুলে পড়েছি। আমার কোনোদিন অসুবিধা হয়নি। পরবর্তী কালে উচ্চশিক্ষায় গিয়ে আমি বহু ভাষা শিখেছি। আমি স্প্যানিশ জানি, জার্মান জানি। আমি ইংরেজি বলতে পারি। আমি আমার ছাত্র-ছাত্রীদের পড়াই ইংরেজিতে। তার মানে এই নয় আমি আমার মাতৃভাষা ভুলে গেছি বা আমার কোনদিন সমস্যা হয়েছে সেই ভাষা চর্চা করতে। সুতরাং আমি এটা বলবো, তোমরা তোমাদের বন্ধু-বান্ধবদের অবশ্যই গর্বের সাথে বলবে আমরা আমাদের স্কুলিং বাংলা ভাষায় অর্থাৎ নিজের মাতৃভাষায় করেছি। একদিন ২১শে ফেব্রুয়ারি 'আমি বাংলায় গান গাই' না বলে প্রত্যেক দিন সেটা নিজের চর্চায়, জীবনবোধের মধ্যে আমরা অনুশীলন করি। আমার মনে হয় সেটা অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ কারণ কোথাও একটা চাপিয়ে দেওয়ার প্রচেষ্টা চলছে একটা স্পেসিফিক ভাষা হল মাধ্যম। আমি কোনও ভাষার বিপক্ষে নই। যেকোনো ভাষা, হোক ইংরেজি, হোক উর্দু। সেটা একটা স্কিল। যত ভাষা শিখবে তত ভালো। কিন্তু ভাষা একটা মাধ্যম এই পর্যন্ত আমরা যেন নিজেদের আবদ্ধ না রাখি। ইংরেজি আমাদের শিখতে হবে, শেখাটা জরুরি কিন্তু মাতৃভাষায় বেসিক শিক্ষাটা ভীষণভাবে জরুরি।

বাগান-ফুল-প্রজাপতি

দেবার্ঘ্য দত্ত (তৃতীয় শ্রেণি)

আমার বাড়ির পাশে একটা বাগান আছে। সেই বাগানে বিকেলে খেলি, রঙিন রঙিন ফুল দেখি যেমন- লাল, হলুদ, কমলা ইত্যাদি । বাগানে দেখি একটা প্রজাপতি উড়ছে, সেইটা একটা ফুলে উপর বসল। প্রজাপতির ডানাটা খুব সুন্দর ছিল লাল, হলুদে ঢাকা। প্রজাপতিটা ফুলের উপর বসে একমনে মধু খাচ্ছিল। এইভাবেই অনেক ফুলে বসে মধু খাচ্ছিল। তারপর বাগানে একটু হাঁটছিলাম, তখন দেখলাম পিঁপড়ে বাসা বেঁধেছে। বাগানে কত ছোটো ছোটো জীবের ঘর। একটা ফুল দেখলাম, ফুলটা ভালো করে রোদ পাচ্ছে না তাই আমাদের বাগানের ফুলের যত্ন নেওয়া উচিত। আমাদের মনে রাখতে হবে যে প্রজাপতির খাবার ফুলের মধু। ফুল ফুটলে তারা আসে।

বাগান-ফুল আর প্রজাপতি

অরিত্রী সাহা (তৃতীয় শ্রেণি)

বাগানে নানান রকমের ফুল দেখতে পাওয়া যায়। ফুলে প্রজাপতি বসে থাকে। দেখতে খুব সুন্দর লাগে। প্রজাপতি দেখতে খুব সুন্দর হয়। ফুলে মৌমাছিরা বসে মধু খায়। শুঁয়োপোকা থেকে প্রজাপতি তৈরী হয়। প্রজাপতি নানান রঙের হয়। প্রজাপতির দুটি ডানা, একটি শুঁড় আছে। প্রজাপতি বেশির ভাগ বাগানে দেখা যায়।

ভোর হলেই পাখিদের গান

সায়ন্তিকা চৌধুরি (তৃতীয় শ্রেণি)

ভোর হলে পাখিদের গান এবং পাখিদের কিচির মিচির। পাখিদের খুব সুন্দর গলার গান আমার খুব ভালো লাগে। পাখিদের মধ্যে আছে কোকিল, চড়ুই, কোয়েল, টিয়া ইত্যাদি। আরো কত কত! কোকিলদের গলার সুর আমার বেশ ভালো লাগে। (পাখিদের মধ্যে পোষ মানে টিয়া পাখি, টিয়া আমার বাড়িতে আছে। আমায় ও নাম ধরে ডাকে।) পাখিদের মধ্যে মুরগিরা ভোর বেলা ডাকে। আমি আমার পরিবারের সঙ্গে একটি গ্রামের দিকে গিয়েছিলাম। তখন ভোরের বেলা সেখানকার পাখিদের গলার সুর আমায় মুগ্ধ করে দিচ্ছিল। কতই না সুন্দর সেই পাখি গলার সুর!

ভোর হলেই শুনি পাখিদের ডাক

অনীশ রায় (তৃতীয় শ্রেণি)

ভোর হলেই আমরা নানারকম পাখিদের ডাক শুনি। যেমন সকালে ওঠার সময় মোরগ ডাকে আমার যখন সকালে স্কুল ছিল। তখন ভোরবেলা উঠে অনেক রকম পাখির ডাক শুনতাম। ভোরবেলা পাখির ডাক শোনার আসল কারন সেই সময় পাখিরা বাসা থেকে খাবার খুঁজতে বেড়িয়ে পড়ে তাই তখন পাখিরা গান করে। সমুদ্রের পারে গেলে প্রচুর শুনি পাখিদের আওয়াজ। আমি যেদিন ভোরবেলা উঠি সেদিন খুব ভাল সেটা শুনতে পাই।

বাগান-ফুল-প্রজাপতি

অলিভিয়া সরকার (তৃতীয় শ্রেণি)

আমি যখন বাগানে ফুল তুলতে যাই তখন রোজ আমি একট প্রজাপতি দেখি। ও তখন মধু খায়। ওকে ধরি আদর করি আবার রেখে দিই। কিন্তু ওকে বাড়ি ছেড়ে আসতে ইচ্ছাই করে না। কিন্তু বাড়ি যে আসতেই হবে। বাগান হলো প্রকৃতির মধ্যে সবচেয়ে সুন্দর জায়গা। আর আমাদের বাগানে প্রচুর প্রচুর ফুল ফোটে। আমাদের একটি ছোট্টো বাগান আছে। আর বাগানে আমার সবচেয়ে প্রিয় ফুলগুলোই ফোটে।

বাগান-ফুল আর প্রজাপতি / ছোট্টদের বাগান

সৃজা দে (তৃতীয় শ্রেণি)

আমাদের বাড়ির পাশেই একটা বাগান আছে। আমি রোজ সকালবেলা বাগানের গাছ গুলোতে জল দিই। বাগানে অনেকরকম গাছ আছে যেমন-পদ্মফুল, জুই ফুল, আমগাছ ইত্যাদি। বাগানের বেশীরভাগই ফুলগাছ ও ফলগাছ আছে। আর সবজির গাছ আছে নব্বইটি। যেমন-পটল, ঝিঙা, বেগুন, লঙ্কা, শশা ইত্যাদি। বাগানে যেহেতু সব গাছেই ফুল ফুটে থাকে তাই প্রজাপতিও বেশি উড়ে বেড়ায়। আমি রোজ সকাল বেলা উঠে মুখ ধুয়ে সেই ফুলের বাগানে যাই। আমি দেখি আর দেখি নানারকম ফুল আর রঙবেরঙের প্রজাপতি। সেই সব দেখে আমার মন ভরে যায়। তারপর আমি স্কুলে চলে যাই এসে আবার ওই বাগানেই যাই। বাগানে দোলনা আছে, ঢেকি আছে। এই হল আমার প্রিয় বাগান যেই বাগানটার নাম হল ছোট্টোদের বাগান।

পাখিরা সুরে সুরে গান গায় আকাশে বাতাসে

ঋষিলা মন্ডল (চতুর্থ শ্রেণি)

ভোরের সময় আমরা পাখির মিষ্টি সুরের গান শুনতে পাই। পাখির মিষ্টি সুরের গান প্রাণ জুড়িয়ে দেয়। পাখির গান শুনলে মনে হয় আকাশ বাতাস একসঙ্গে পাখির তালে তলে গান গাইছে। ময়না, শালিক, বাবুই সবাই কী-সুন্দর তালে তালে গান গায়। ভোরের চারিদিক পাখির গানে সুন্দর হয়ে ওঠে। পাখিরা কী-সুন্দর পাখা মেলে আকাশে মিষ্টি আওয়াজ করতে করতে যায়। পৃথিবীর সবথেকে মিষ্টি প্রাণী হল পাখি। পাখির জন্যই প্রকৃতি আরও সুন্দর হয়ে উঠেছে।

সবুজ পাহাড় ডাকে আয়রে ছুটে আয়! নদীর ধারে ধারে আয়রে ছুটে আয়!

অদ্রিজা দাস (চতুর্থ শ্রেণি)

আমাদের প্রকৃতি দেখতে সুন্দর। আমাদের এই প্রকৃতিতে অনেক মানুষ, পশু পাখি এবং আরো নানা জিনিস দেখতে পাই। আমরা দেখি যে আমাদের এই প্রকৃতি বিভিন্ন ঋতুতে বিভিন্ন সাজে সেজে ওঠে। শীতকালে সবুজ পাহাড় আমাদের ডাকে। যখন আমরা পাহাড়ে বেড়াতে যাই, তখন সেখানে আমরা দেখতে পাই মেঘে যেন আকাশ ঢেকে আছে। তখন যেন আমাদের অন্তর সেখান থেকে আর ফিরতে চায় না।

পাখিরা সুরে সুরে গান গায় আকাশে বাতাসে

সুচরিতা মন্ডল (চতুর্থ শ্রেণি)

আমাদের বসবাস পশ্চিমবঙ্গে। তাই আমরা সকালে ঘুম থেকে উঠে সন্ধে পর্যন্ত অনেক পাখি দেখতে পাই। পশ্চিমবঙ্গে বহু নদী-নালা, পুকুর থাকায় শীতকালে বিদেশ থেকে আসা পাখিগুলিকে আমরা জলাশয়ের ধারে দেখতে পাই। সকালবেলা কাকের ডাকে আমরা জেগে উঠি। এখন গ্রীষ্মকাল, এই সময় চাতক পাখির ডাক 'ফটিকজল' শোনা যায়। বসন্তকালে শোনা যায় কোকিলের 'কুহু' ডাক। বসন্তকালের আকাশে অনেক পাখিকে দেখা যায় ও তাদের ডাক শোনা যায়। পাখির ডাক বড়োই মধুর, আমাদের মন জুড়িয়ে দেয়। আমার বাড়িতে বাসা বেঁধেছে এক পায়রা। পায়রার মিষ্টি মধুর গান 'বক-বকম' শুনে মাঝে মাঝে আমাদের মুগ্ধ হতে হয়। চড়ুই পাখির ডাক খুব মিষ্টি হয়। অনেক পাখি আবার মানুষের মতো কথা বলতে পারে। যেমন টিয়া পাখি। অনেক পাখি আবার সবার ডাক নকল করতে পারে, যেমন- ফিঙে পাখি। শরৎকালের পরিবেশ খুব মনোরম থাকায় বহু পাখিকে দেখা যায়। পশ্চিমবঙ্গের পাখিদের অপরূপ শোভা হয়। খুব মিষ্টি মধুর হয়। তাদের সুরে ভরে থাকে আমাদের আকাশ বাতাস।

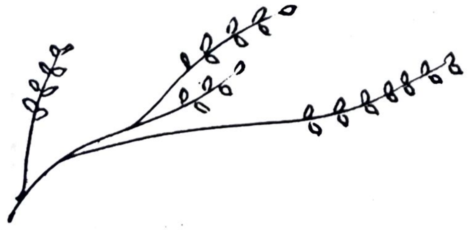

সবুজ পাহাড় ডাকে আয়রে ছুটে আয়! নদীর ধারে ধারে আয়রে ছুটে আয়!

সঙ্গীতা দাস (চতুর্থ শ্রেণি)

আমি যখন ঘুমোই তখন আমায় সবুজ পাহাড় ডাকে, 'আয়, ছুটে আয় আমার বুকে, দেখে যা আমার সৌন্দর্য! কেমন আমি চুপ, সবুজ রূপোলি চাদর ঢাকা আমার গায়ে, আমার নীচে কেমন সুন্দর জঙ্গল, কেমন সুন্দর নদী বয়ে যাচ্ছে আমার গা দিয়ে!' সেই জঙ্গলে কত পাখি কত পশু তারা আমায় ডাক দেয়, 'আয়রে ছুটে আয় আমাদের এই জঙ্গলে সুন্দর গাছে ঢাকা আমাদের এই জঙ্গল!' নদী আমাকে ডাকে পাহাড়ের গা দিয়ে বয়ে চলা নদী বলে, 'আয়রে ছুটে আয় আমার কাছে। আমার সুন্দর জলে স্নান কর।' পাহাড়ের উপর দিয়ে যায় পাখি। তারা ডাকে সুরে সুরে গান গেয়ে 'আয়রে ছুটে আয়, আমার সঙ্গে যাবি চল'।

বিজ্ঞান মনস্ক, ভ্রমণ পিপাসু শ্রদ্ধেয় শিক্ষক নরেশ চন্দ্র কংসবনিক মহাশয়কে বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা স্মরণ করেছে তাদের লেখনীর মাধ্যমে, যা বিচিত্রার বিষয় : বিজ্ঞান ও ভ্রমণ।

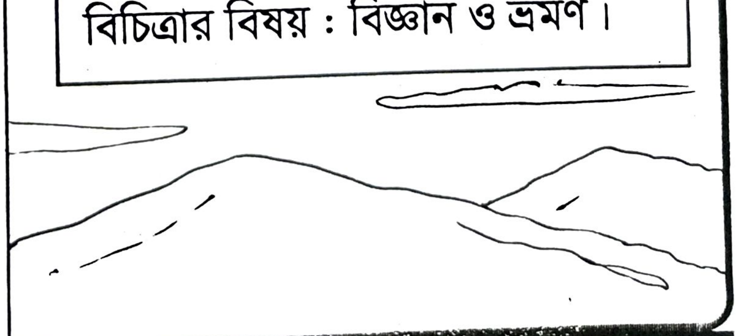

মুকুল ছেড়ে যাব দূরে

মৌবনি ভট্টাচার্য (পঞ্চম শ্রেণি)

দৈনন্দিন জীবনে যখন একঘেয়োমি লাগতে শুরু করে, তখন মন ঘোড়ার মতো ছুটে চলে যায়, অনেক দূরে তাই আমরাও মন পরিষ্কার করবার জন্য মাঝে মধ্যে দৈনিক ব্যস্ততার মধ্যেও অনেক দূরের প্রান্তে পাড়ি দিই। অনেক দূরে ঘুরতে যাই, মনটাকে সতেজ ও শরীরটাকে সুস্থ করতে। তাই আমারও ইচ্ছা করে প্রকৃতির কোলের কাছে ঘুরতে যেতে যেখানে আমি প্রকৃতিকে বন্ধু হিসাবে পাব। যেখানকার পরিবেশ দূষণমুক্ত ও নির্মল হবে। আমার ইচ্ছা করে দেশ ছেড়ে এমন জায়গায় যেতে। আমার ইচ্ছা করে হরিদ্বার যেতে। যেখানে আমি প্রকৃতি মাকে কাছে পাব, সেখানে আমি পাহাড়, নদী, জলপ্রপাত দেখতে পাব আর পাব অচেনা জায়গার শোভা। মানুষ অচেনা জায়গায় যায় সেই জায়গাটিকে চিনতে, বুঝতে, জ্ঞান লাভ করতে। অচেনা জায়গায় গিয়ে আমি বুঝতে পারি যে প্রকৃতি কেমন! প্রকৃতিকে চেনা বাড়ির চেনা পরিবেশ ছেড়ে নতুন পরিবেশে ঘুরতে যেতে ভালই লাগে।

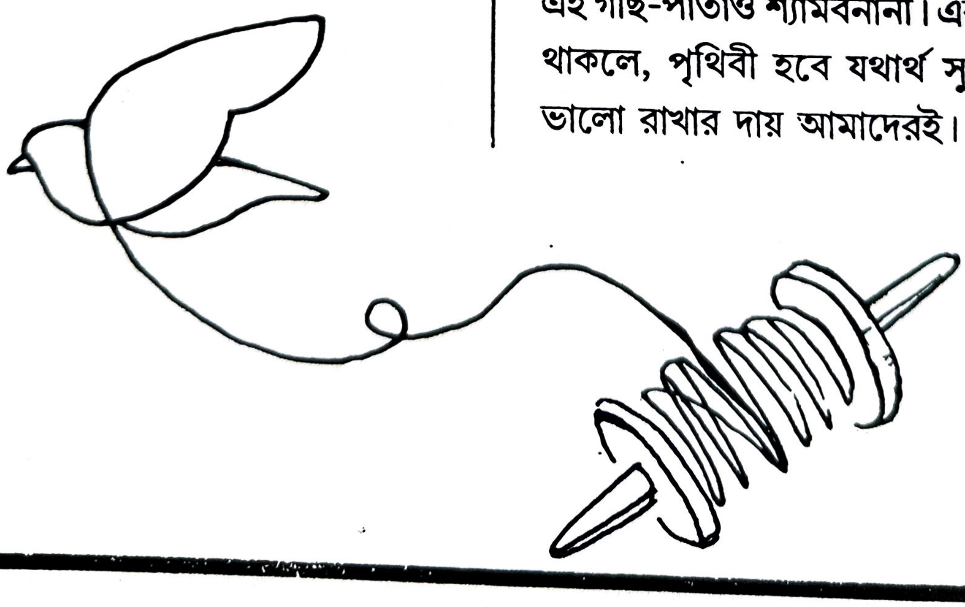

ভালো থেকো মেঘ মিটিমিটি তারা ভালো থেকো পাখি, সবুজ পাতারা

দেবজ্যোতি দাস(পঞ্চম শ্রেণি)

পরিবেশ যেন এক মহা-মায়া, যার সৌন্দর্য সবাইকে ছাপিয়ে যায়। এই পরিবেশ ছাড়া পৃথিবীতে কোন প্রাণের জন্মই হত না, পৃথিবী হত না গতিময়, প্রাণময়। এখানে বাস কারে নানা কীট-পতঙ্গ-প্রানীরা। এ যেন এক বিরাট প্রাণভান্ডার। এখানকার মেঘ, পাখি, সবুজ পাতারা এই পরিবেশের অপরূপ সৌন্দর্যের উদাহরণের ভার বয়ে নিয়ে আসছে এতদিন, চিরকাল তাই করবে। আকাশে ভাসমান মেখে যাযাবরের মতো এদিক- সেদিক উড়ে উড়ে ঘুরে বেড়ায় ও বিভিন্ন ঋতুর আগমন সংবাদ পৌঁছে দেয় দেশে বিদেশে। রাতের আকাশে যেন তারারা মিটমিট করে ও সৌন্দর্যে ভরিয়ে তলে আকাশ। এই অরণ্য ও এর গাছেরা যে সবুজ সরস প্রাণের ভান্ডার। এখানে বসবাস করে নানা প্রাণী ও পাখি। প্রাণের সমাগমে পরিপূর্ণ থাকে এই অরণ্য। নানা পাখির বাসস্থান এই গাছ-পাতাও শ্যামবনানী। এরা সকলে ভালো থাকলে, পৃথিবী হবে যথার্থ সুন্দর । সকলকে ভালো রাখার দায় আমাদেরই।

বিজ্ঞান শিবির অভিজ্ঞতা

সৌরদীপ্ত শীল (ষষ্ঠ শ্রেণি)

বিজ্ঞানের সঙ্গে আমাদের পরিচয় সেই আদিকাল থেকে, পৃথিবীতে যা কিছু সংগঠিত হচ্ছে, তার মূলে আছে বিজ্ঞান। জীবনের প্রতিদিনের চলাতে সাহায্য করে এই বিজ্ঞান। এককথায় বিজ্ঞান ছাড়া আমরা অচল। এই বিজ্ঞানের চেতনা আমাদের ভেতরে জাগিয়ে তুলতে আমাদের বিদ্যালয়ে প্রতি বছর বিজ্ঞান শিবির পালিত হয়। ভারতীয় পদার্থবিদ স্যার চন্দ্রশেখর ভেঙ্কটেশ্বর রমন দ্বারা ২৮শে ফেব্রুয়ারি রমন এফেক্ট আবিষ্কারের জন্য প্রতি বছরে ২৮শে ফেব্রুয়ারি দিনটিকে বলা হয় 'জাতীয় বিজ্ঞান দিবস'। এই দিনটিকে সম্মান জানিয়ে আমাদের বিদ্যালয়ে ৬,৭ও ৮ই মার্চ বিজ্ঞান শিবির পালিত হয়। ষষ্ঠ শ্রেণির শিক্ষার্থীরা অর্থাৎ আমরা এই তিন দিনে ৬ টি কর্নারে গিয়েছিলাম। আমাদের বিভাগ অর্থাৎ C-II ৬ তারিখ প্রকৃতির পাঠশালায় কুলিয়াপাটের বিলে গিয়ে প্রকৃতির কোলে বসে প্রকৃতিচর্চা করেছি। ফিরে এসে আমরা গেলাম নিরীক্ষণ ১ও ২ কর্নারে ঘুরেছি, দাদা ও দিদিরা আমাদের খুব ভালো ভাবে তাদের বিষয়গুলি বুঝিয়ে দিয়েছে। দ্বিতীয় দিনে আমরা 'আমাদের দেশ' কর্নারে গিয়ে পৃথিবীর সৃষ্টি থেকে ভারতের বর্তমান অবস্থা অবধি দাদা-দিদিরা আমাদের বুঝিয়েছে। এরপর আমরা 'আঙ্কিক' কর্নারে মজার ছলে অঙ্কের বিষয়গুলি বুঝেছি। তৃতীয় দিনে আমরা 'স্বাস্থ্য' কর্নার ১ও২ কর্নারে নিজেদের স্বাস্থ্য কীভাবে ভালো রাখব সেই বার্তাই আমাদের দেওয়া হয়েছে, তারপর আমরা 'সৃজনী সৃষ্টি'তে গিয়ে নানা হাতের কাজ শিখলাম। এরপরই আমরা গেলাম 'সৃজনী কৃষ্টি' কর্নারে যেখানে বিভিন্ন গান, আবৃত্তি ও নাটক করানো হয়েছিল। ও শেষে মঞ্চে আমাদের বানানো নাটক, আবৃত্তি ও গানগুলি পরিবেশন করেছিলাম। ষষ্ঠ শ্রেণির বিজ্ঞান শিবির আমাদের কাছে স্মরণীয় হয়ে থাকবে আজীবন।

"আমি ক্লাসে এত করিয়া ছাত্রদের পড়াইলাম, যে পৃথিবীর ছায়া চাঁদের উপর পড়িয়া চন্দ্রগ্রহণ হয়। তাহারা তা পড়িল, লিখিল, নম্বর পাইল, পাশ করিল। কিন্তু মজার ব্যাপার হইল যখন আবার সত্যি সত্যি চন্দ্রগ্রহণ হইল তখন চন্দ্রকে রাহু গ্রাস করিয়াছে বলিয়া তাহারা ঢোল, করতাল, শঙ্খ লইয়া রাস্তায় বাহির হইয়া পড়িল। ইহা এক আশ্চর্য ভারতবর্ষ।"

-আচার্য প্রফুল্ল চন্দ্র রায়

অন্তরের শুদ্ধিকরণের মন্ত্র

রিহান মণ্ডল (ষষ্ঠ শ্রেণি)

বিজ্ঞান হল সমগ্র মানবজাতির মুক্তির প্রতীক। অন্ধকারময় মূঢ়তা কুসংস্কারপূর্ণ এ দেশে বিজ্ঞান শিক্ষা জয়যাত্রা সূচনালাভ করে ব্রিটিশ আমলে। রাজনৈতিক কারাপাশে বন্দি সে বিজ্ঞানচর্চা উন্মুক্ত হয় স্বাধীনতার কয়েক দশক পর থেকে। বিজ্ঞান হল মানবসভ্যতার অগ্রগতির বিজয় নিশান।

তবে আজ একবিংশ শতাব্দীর তৃতীয় দশকে দাঁড়িয়েও আমরা অনেক কুসংস্কার, অন্ধবিশ্বাস এর প্রাচীর ভাঙতে অক্ষম। এর মূল কারণ হল পুঁথিগত, মুখস্থবিদ্যায় বিজ্ঞানচর্চা। বিজ্ঞান সম্বন্ধে জ্ঞান লাভ করলেও তা আমরা সীমাবদ্ধ রেখেছি পরীক্ষা পড়াশোনার গণ্ডির মধ্যে, বাস্তব জগতে তার কার্যকরিতা সম্বন্ধে সম্যক জ্ঞানের অভাব আমাদের। এই সবকিছুর শূন্যতাকে পূরণ করার প্রয়াসই এই বিজ্ঞান শিবির। অর্থাৎ এর মূল উদ্দেশ্য হল পুঁথিগত শিক্ষাকে, বাস্তব জীবনে ব্যবহারের কার্যকারী করে তোলা। নিরীক্ষণ, আমাদের দেশ, স্বাস্থ্য, আঙ্কিক প্রকৃতির পাঠশালা, সৃজনীর মত বিভিন্ন বিভাগের সমন্বয়ে গঠিত এই বিজ্ঞান শিবির।

পদার্থ বিজ্ঞান, রসায়ন এবং জীববিজ্ঞানের বিভিন্ন বিষয়ের গ্রন্থে দেখানো, এবং তার বাইরেও বিভিন্ন পরীক্ষা-নিরীক্ষা স্থান পেয়েছিল এই শিবিরের নিরীক্ষণ বিভাগে। পৃথিবীর সৃষ্টি, আদি সভ্যতা, ভারতের ভূ-প্রাকৃতিক বিভাজন, ব্রিটিশ ভারত ইত্যাদি বিষয় স্থান পেয়েছিল আমাদের দেশ বিভাগে। ইতিহাসের উত্থান-পতন সম্বন্ধে জ্ঞানলাভ আমাদের ভবিষ্যতে চলার পথকে মসৃণ করে। বিভিন্ন ভারতীয় গণিতজ্ঞ, তাদের অবদান এছাড়াও অঙ্কের বিভিন্ন বিষয়ে পূর্ণ ছিল আঙ্কিক বিভাগ।

বিজ্ঞানচর্চার জন্য প্রথমে প্রয়োজন মানুষের চিন্তাশক্তি এবং যুক্তিবোধ। যা উভয়ই বিকাশিত হয় মানুষের সৃজনশীলতার মাধ্যমে। এই সৃজনশীলতা মানুষকে যুক্তিযুক্ত কল্পনা করতে শেখায় এবং এই কল্পনাই বিজ্ঞানের মূল ভিত্তি। সৃজনশীলতাকে জাগ্রত করার জন্য ছিল দুটি বিভাগ - সৃজনী ও কৃষ্টি এবং সৃজনী ও সৃষ্টি।

আমরা জানি যে প্রকৃতিই আমাদের জীবনের চালিকাশক্তি। এই প্রকৃতিকে জানার মাধ্যমেই আমরা আমাদের এই মানবসভ্যতাকে অগ্রগতির পথে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারি। এই প্রকৃতিকে পর্যবেক্ষণের জন্য ছিল বিশেষ একটি বিভাগ, যার নাম প্রকৃতির পাঠশালা। এটি আমাদেরকে প্রকৃতি সম্বন্ধে জ্ঞানার্জনে সাহায্য করেছে।

বিজ্ঞানশিবির তিন দিন ধরে চলেছিল। কিন্তু এর প্রভাব সুবিস্তৃত। এই তিনদিন আমাদের মনে যে অনুসন্ধানের ইচ্ছাকে জাগ্রত করছে এবং যে নতুন দৃষ্টিভঙ্গিতে পৃথিবীকে দেখতে শিখিয়েছে, তা সত্যিই প্রশংসনীয়।

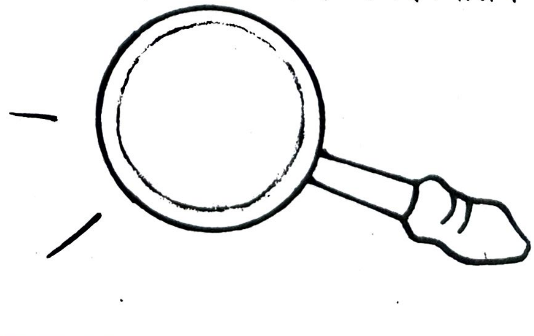

বিজ্ঞান শিবিরের অভিজ্ঞতা

সম্পূরণ পাত্র (ষষ্ঠ শ্রেণি)

এবছর ষষ্ঠ শ্রেণিতে উঠে এক ঘোরতর অসুবিধায় পড়লাম। বিজ্ঞান শিবিরে কী করব তা ঠাওর করে উঠতে পারছিলাম না। বন্ধুরা কেউ বলছে ঘোরাতে নিয়ে যাবে। আমার এক খটকা লাগল। তারপর ধীরে ধীরে যেন কালো চাঁদোয়া সরে গেল। বলা হল এবার ষষ্ঠ শ্রেণির শিক্ষার্থীদের মডেল তৈরি করতে হবে না। কিছু শিক্ষণীয় বিভাগ থাকবে। ওখানে আমাদের যেতে হবে ও বিজ্ঞানের নানা বিষয়ে জ্ঞান অর্জন করতে হবে। প্রার্থনার সময় এসে দেখি ব্যাগ বিতরণ করা হচ্ছে। তাতে একটি খাতা ও এক পেন। প্রথম দিন গেলাম 'স্বাস্থ্য' বিভাগে। মোট ছটা বিভাগ- 'স্বাস্থ্য', 'সৃজনী', 'প্রকৃতির পাঠশালা', 'নিরীক্ষণ', 'আমাদের দেশ', 'আঙ্কিক'। ওআরএস, ভিটামিন, কী খাব, কী খাব না, দৃষ্টি, ভেষজ উদ্ভিদ ইত্যাদি বিষয়ে নানা কিছু জানা গেল। এরপর ছিল যোগাসন। উফ! কী কঠিন ছিল সূর্য নমস্কার। এরপর গেলাম সৃজনী-'কৃষ্টি' ও সৃষ্টি বিভাগ। ওখানে গান আবৃত্তি ছিল। গান-আবৃত্তিতে আমি বরাবরই ভালো। তবে বিষয় ছিল -'এক শালিকেও দিন ভালো যায়'। আমি নাটকে ছিলাম ও কিছুজন গানও তৈরি করছিল। সেটা পরে অবশ্য মুক্তধারা মঞ্চে অনুষ্ঠিত হল। পরদিন গেলাম প্রকৃতির পাঠশালা। কুলিয়াপাটের জল দেখে আমি হেসে বলেছিলাম, 'জল নয় লেমোনেড'। বটগাছের গায়ে শামুক ছত্রাক ইত্যাদি লেগে ছিল। ভাটফুলও দেখলাম, পরিষ্কার শুভ্র রঙের। এরপর নিরীক্ষণ-এ গেলাম, এই বিভাগ খুব ভালো লেগেছে। নানারকম বিজ্ঞানে সাঁতার কাটছি যখন তরঙ্গ, অ্যাসিড, মাইক্রোস্কোপ ইত্যাদির চর্চা চলছিল। 'আমাদের দেশ' বিভাগে নিজের দেশের কথা জানলাম। সবচেয়ে ভালো লাগল 'বিগ ব্যাং থিয়োরি'। এরপর 'আঙ্কিক'। এই কর্নারও দারুন লেগেছে। অঙ্কের সূত্র জানা গেল। এক দিদি ম্যাজিকের মতো অঙ্ক করে আমার জন্মদিন, বার করে দিল। প্রথম দুদিন 'বিড়লা মিউজিয়াম' থেকে এসেছিল এক বিজ্ঞানের বাস। অনেক কিছুই দেখলাম। তবে বিরাট জ্ঞানভাণ্ডারের কিছু সামান্য নুড়িই কুড়োলাম।

> "যারা বলেন বাংলাভাষায় বিজ্ঞান চর্চা হয়না, তারা হয় বাংলা জানেন না, নয় বিজ্ঞান বোঝেন না"
>
> -বিজ্ঞানী সত্যেন্দ্রনাথ বসু

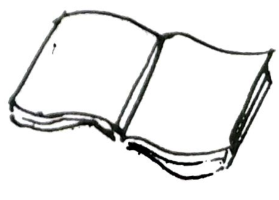

নতুন দেশ, অন্য সংস্কৃতি, ভিন্ন জীবনযাত্রাঃ জানার জন্য ভ্রমণ

অনিন্তিকা চক্রবর্তী (সপ্তম শ্রেণি)

"পৃথিবীর সবকটা দরজা ভাই,
খুলে চলো চারিদিকে ছুটে যাই,
পাহাড়ের, সাগরে, জঙ্গলে, নদীতে
কী আছে দেখতে চাই"

এই পৃথিবীর সমস্ত আশ্চর্য দর্শনের দ্বার উন্মুক্ত করে ভ্রমণ। ভ্রমণপিপাসু মনের টানেই মানুষ ছুটে যায় এই বহুবিচিত্র পৃথিবীর নানা দুর্গম স্থানে, নতুন দেশে। তারা মিলিত হয় বহু নতুন মানুষের সঙ্গে তাদের ভিন্ন, অনন্য সংস্কৃতি এবং জীবনযাত্রার সঙ্গে। মানুষ আদিকাল থেকেই পৃথিবীর পরিবেশের সাথে অভিযোজিত হওয়ার জন্য যা করে আসছে, তাই হলো তাঁর সংস্কৃতি। এই সংস্কৃতি ভিন্ন ভিন্ন জায়গায় অনন্য। যেমন আমাদের দেশের সংস্কৃতি একরকম, আবার জার্মানি, জাপান প্রভৃতি দেশের সংস্কৃতি আর একরকম। আবার আমাদের দেশে বিভিন্ন রাজ্যে বিভিন্ন ধরণের মানুষ বসবাস করে। তাদের উৎসব-আচার-অনুষ্ঠান, খাদ্যাভ্যাস, পোশাক - পরিচ্ছদ, সংস্কৃতি সবই আলাদা। আবার এই সংস্কৃতির সাথে মানুষের জীবনযাত্রা ওতপ্রতভাবে জড়িয়ে থাকে। ফলে এই ভিন্ন সংস্কৃতির মানুষের জীবনযাত্রাও হয় ভিন্ন। এই যেমন - জাপানিরা কিমোনো নামক ঐতিহ্য-বাহী পোশাক পরে, খাবারে খায় সুসী, কথা বলে, সাহিত্য রচনা করে জাপানি ভাষী। আবার আমাদের তামিলনাড়ু রাজ্যে মানুষ সাদা ধুতি, সাদা শাড়ি পরে, খাবারে খায় ইডলি, ধোসা, সাম্বার, কথা বলে, সাহিত্য লেখে তামিল ভাষায়। অর্থাৎ এই বিচিত্রময় পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানে বহুবিচিত্র সংস্কৃতির, জীবনযাত্রার মানুষকে দেখা যায়। এইসব সম্পর্কে বই পড়ে, বা ইন্টারনেট থেকে জানতেই পারি, তবে আমার চোখে ভ্রমণই শ্রেয়। কারণ নিজে চোখে সবটা দেখা, নিজস্ব হৃদয়ের মণিকোঠায় অনাস্বাদিত ভ্রমণরস সমৃদ্ধ অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করা, অজানাকে জানা, অচেনাকে চেনার প্রকৃষ্ট উপায়ই ভ্রমণ।

তাই শেষে বলব- "Travelling is the best way to explore all the places of the earth which are rich in diversity"

"দেখা হয় নাই চক্ষু মেলিয়া
ঘর হতে শুধু দুই পা ফেলিয়া
একটি ধানের শিষের উপরে
একটি শিশির বিন্দু"।
– রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

অচেনাকে চেনা ও অজানাকে জানার আনন্দ ভ্রমণ

ঐশানী শীল (সপ্তম শ্রেণি)

"চিত্ত যেথা ভয়শূন্য
উচ্চ যেথা শির"
-কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

অর্থাৎ যেখানে আমাদের মন ভয়শূন্য হয় ও যেখানে জানা ও চেনার নতুন পথ উদয় হয়, তাই হল নিজের জ্ঞানের সীমাকে বাড়ানোর সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য উপায়। বিজ্ঞানীরা তো এই পন্থাকে কাজে লাগিয়েই মহাজাগতিক সবচেয়ে রহস্যময় জিনিস ব্ল্যাক হোল-কেও আবিষ্কার করে ফেলেছেন। আসলে নিজের জ্ঞানের পরিধি সুদূর করার জন্য অনেক জায়গা পরিক্রমণ, বিজ্ঞানী কিংবা বড়ো কোন মানুষ হতে হয় না। চারপাশের সকল জিনিসকে পর্যবেক্ষণ করলেই আমরাও আমাদের আত্মবোধ, শিক্ষার সীমানা বাড়াতে পারবো। তাই তো মনে পড়ে পংক্তিগুলি-

"দেখা হয় নাই চক্ষু মেলিয়া
ঘর হতে শুধু দুই পা ফেলিয়া
একটি ধানের শিষের উপর
একটি শিশিরবিন্দু"

আমাদের মনে রাখা উচিত যে বিজ্ঞানী গোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য কিন্তু সাধারণ বাংলার কীটপতঙ্গদের নিয়েই গবেষণা করেছিলেন। তাই আমরা একটু ঘরের বাইরে বেরিয়ে দেখিই না বাড়ির চারিপাশে কী আছে। আমাদের বাড়িতে কাঞ্চন ফুল গাছ বা অনেকে তো আমরা কচু পাতাও দেখেছি। আমরা তো নিশ্চয় খেয়াল করেছি যে এই কচু পাতা বা কাঞ্চন ফুল গাছের পাতায় জলের ফোঁটা ফেললে সেই জলের ফোঁটা নিচে পড়ে যায় বা সেভাবেই থেকে যায়। এই ঘটনাকে পাতার জলের প্রতি ভয় বা ফোবিয়া বলি যা বিজ্ঞানের একটি নিরীক্ষণ। এভাবেই তো আমরা আমাদের অজানা নানান জিনিস একটু পর্যবেক্ষনের মাধ্যমেই জানতে পারি। আসলে অচেনার 'অ' বাদ দিলে চেনা ও অজানার 'অ' বাদ দিলে হয়ে যায় জানা। আমাদের মন থেকে এই অ-গুলি বাদ দিয়েই নানা জিনিসের সঙ্গে নিজেকে পরিচিত করতে হবে। এই জানার আগ্রহর মাধ্যমেই আমরা জানার আনন্দ থেকে ভ্রমণে অগ্রসর হতে পারব। সব কিছুই বিবেচনা করে বুঝতে পারব।

"অন্তর মম বিকশিত করো
অন্তরতর হে
নির্মল করো, উজ্জ্বল করো,
সুন্দর কর হে"

নিজের মনের নিরীক্ষণের দ্বারটা খুললেই জানতে পারবো নানান জিনিস। সর্বপরি অচেনাকে চেনা, ও অজানাকে জানার আনন্দ ভ্রমণে নিজেকে সংযুক্ত করতে সক্ষম হবো ও উপলব্ধি করতে পারবো এই আনন্দময় ভ্রমণকে।

অজানাকে জানা, অচেনাকে চেনাই ভ্রমনঃ মানসভ্রমণ

অচিরাভা দেববর্মন (সপ্তম শ্রেণি)

'থাকব নাকো বদ্ধ ঘরে
দেখবো এবার জগৎটাকে'
- কাজী নজরুল ইসলাম

মানুষের মন অনুসন্ধিৎসু, সর্বদা নতুন কিছু জানার আগ্রহে তার মন উদগ্রীব হয়ে থাকে। তাই অজানাকে জানা ও অচেনাকে চেনার জন্য এক সেরা উপায় হলো ভ্রমণ। সব মানুষই ভ্রমণ করেতে খুব পছন্দ করেন, তা পায়ে হেঁটেই হোক অথবা রেলগাড়ি বা উড়োজাহাজই হোক, ভ্রমন মাত্রই আবিষ্কার-এর উত্তেজনা। তবে ভ্রমণ মানেই যে লোটা-কম্বল নিয়ে যাত্রা তা নয়, মানসভ্রমণ -এর মধ্যেও লুকিয়ে থাকে অজানাকে জানা ও অচেনাকে চেনার উত্তেজনা, যেমন ছুটির দিনের দুপুরগুলো আমার কেটে যায় নিজের মনের মধ্যেই অ্যাডভেঞ্চার করতে করতে। মাঝে মাঝে জানলায় বসেও আমি চারপাশের যা গাছপালা দেখি সময় কেটে যায় তাদের মনের মধ্যে কী চলছে, তারা কী বলতে চাইছে সেইসব কল্পনা করতে করতেই, তাদের সঙ্গে কথাও বলি মাঝেমাঝে। তবে হঠাৎ করে যখন মা চলে আসেন, আমি চমকে উঠি। তারপর এতক্ষণ ধরে কী আবোল তাবোল কথা বলছিলাম সেটা ভাবলে নিজেরই হাসি পায়। এই কালই আমার পড়ার টেবিলটাকে দেখে মনে হচ্ছিল টেবিলটা বলছে, 'আচ্ছা, এই মেয়েটার কী কোনো আক্কেল নেই? এত এত বই পত্র চাপিয়ে রেখেছে আমার পিঠে।' আমি বলে উঠলাম 'আমার কী দোষ? পড়ার টেবিলে বই না রাখলে রাখব কোথায়?' ঠিক তখনই আমার মা ঢুকে পড়লেন, তখন মায়ের মনের মধ্যে একটু ঢুকে পড়লাম, দেখলাম মা ভাবছেন, 'আর মাত্র দুটো দিন বাকি, এদিকে এখন খাতা দেখা শেষ হল না।' আরেকটু হলেই বলে ফেলতাম 'আজ রাতটা জেগে খাতা দেখে নাও, প্রবলেম সলভড।' কিন্তু অতি কষ্টে নিজেকে আটকালাম, যাইহোক, আমার মানসভ্রমণের কাহিনি। এবার নিজের মনের মধ্যে একটু অ্যাডভেঞ্চার চালিয়ে নাও।

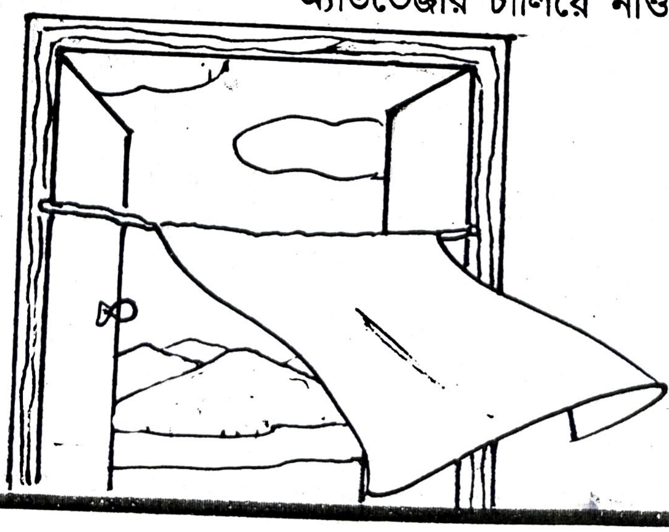

আমি প্রকৃতিপ্রেমী হতে চাই

অনেশ দত্ত (অষ্টম শ্রেণি)

একজন সত্য প্রকৃতিপ্রেমী হল যে প্রকৃতিকে তার মন দিয়ে ভালোবাসে। প্রকৃতির নানা অংশকে যেমন গাছ, আকাশ, নদী প্রভৃতিকে নিজের করে নেওয়া ও তাদের দেখাশোনা করা- যাতে কেউ তাদের আঘাত করতে না পারে। এইসবই একজন সত্য প্রকৃতিপ্রেমী করে থাকে। প্রকৃতিপ্রেমীদের আরেকটি ভালো গুণ হল- তারা কখনও অন্যদের সঙ্গে কানাকড়ি নিয়ে বিবাদ করে নিজের জীবনকে জটিল করে তোলে না। এরা সহজ সরলভাবে নিজের জীবন পরিচালনা করতে জানে এবং কোথায় প্রকৃতির আনন্দ আছে তাও এদের জানা। যা হল প্রকৃতির কোল। এদের জীবন কখনওই যান্ত্রিক হয় না। কারণ এরজন্য সত্য প্রকৃতিপ্রেমী বাড়ির চারদেওয়ালের থেকে বেরিয়ে খোলা মেলা জায়গায় তাদের জীবনের বেশি সময় কাটায়। জীবনে তাদের একটি নির্দিষ্ট উদ্দেশ্য থাকলেও তারা তা পাওয়ার জন্য প্রকৃতি বা মানুষকে আহত বা নত করেন না। এই প্রকৃতি প্রেমীদের শ্রদ্ধা করা উচিত কারণ এরা আমাদের প্রকৃতিকে রক্ষা করে আর প্রকৃতির জন্যই আমরা বেঁচে আছি। প্রকৃতি না থাকলে আমরা বেঁচে থাকতে পারতাম না। নদীর প্রবাহ, রামধনু, গাছে ফোটা সুন্দর ও মনোরম ফুল এবং আকাশের নানান বৈচিত্র্যের সৌন্দর্য একজন প্রকৃতি প্রেমীই উপভোগ করতে পারে। এইসব ভালো গুণ ও আনন্দের জন্য আমিও প্রকৃতিপ্রেমী হতে চাই ও প্রকৃতিকে বাঁচাতে চাই।

আমি প্রকৃতিপ্রেমী হতে চাই

শ্রীদীপ্তা রায় (অষ্টম শ্রেণি)

'পৃথীবীর সব কটা
দরজা ভাই,
খুলে চলো চারিদিকে ছুটে যাই
পাহাড়ে, সাগরে, জঙ্গলে, নদীতে
কী আছে দেখতে চাই।'

আমাদের মা যেমন নিজের কোলে পিঠে নিয়ে আমাদের বড় করে, ঠিক তেমনই এই প্রকৃতির ধুলো-মাটিতে আমরা বেড়ে উঠি। কোথাও শুষ্ক মরুভূমি, আবার কোথাও সাদা কাপড়ে মোড়া শীতল ভূমি। কোনোখানে গভীর খাত আবার কোথাও সুউচ্চ গিরিমালা, এই সব কিছু মিলেই প্রকৃতি মা বিরাজ করেছে এই ভুবনে।

ছোটবেলা থেকেই প্রকৃতি আমায় বড্ড আকৃষ্ট করে। মনে হয় এই রূপসী বাংলাতে জন্মে কতই না সার্থক হয়েছি। ছেলে-বেলা থেকেই এই অদ্ভুত ইচ্ছা যেন আমাকে এই প্রকৃতির প্রতি ভালোবাসার বন্ধনে আবদ্ধ করে রেখেছে। তাই এখনও যখন সুযোগ পাই ছুটে চলে যাই প্রকৃতির মাঝে। কখনও পাহাড়ের কোলে, কখনও বা কলকল শব্দে বয়ে যাওয়া নদীর বাঁকে।

তাই আমি একজন প্রকৃতিপ্রেমী হতে চাই। বিশ্বকবি যেমন চার দেওয়ালের মাঝে নিজেকে আটকে রাখতে পারতেন না, ঠিক তেমনই জানালা দিয়ে প্রকৃতি দেখা-এই বিষয়টি কেমন যেন ভালো লাগে না।

শুধু প্রকৃতি দেখব আর তার কোনো খেয়াল রাখব না-ঠিক 'কাজের বেলায় কাজী, কাজ ফুরোলে পাজি'-এর মত অবস্থা। একজন প্রকৃতিপ্রেমী যেমন হব, তার আনন্দ পাওয়াতেও আমিও খুশি হবো। প্রত্যেক বছরে আমি অনেক রকমের গাছ লাগাই। বিশেষ করে ৫ই জুন দিনটাতে, আমাদের আপনজনকে কেউ আঘাত দিলে যেমন বেদনা হয় ঠিক তেমনই এই প্রকৃতিকে নোংরা করলে বড়ো কষ্ট হয়। তাই সকলের প্রতি অনুরোধ এই প্রকৃতির সাহায্যের জন্য সময় নাই থাকতে পারে, কিন্তু তাকে দূষিত কোরো না। বরং, তাকে আপনজনের মত ভালোবাসো।

সবশেষে বলতে চাই,
আবার আসিব ফিরে, ধানসিড়িটির তীরে এই বাংলায়।

প্রকৃতি বড়ো দয়ালু, কিন্তু সে যখন ক্রুদ্ধ হয়ে উঠবে, তখন তোমরা নিজেদের বড়ো দোষী মনে করবে। এখনও সময় আছে।

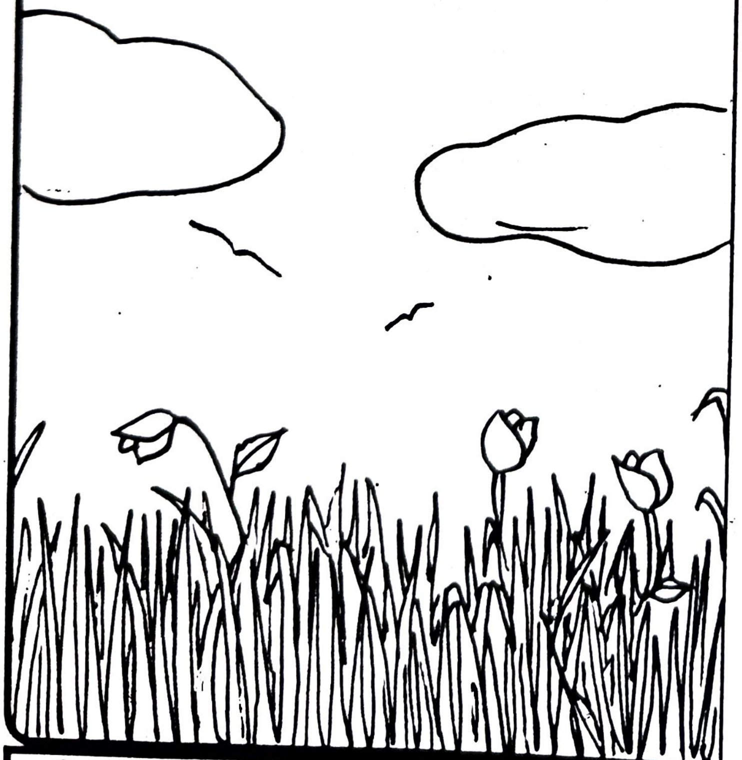

এক প্রকৃতিপ্রেমীর গল্প

হৃদ্ধিমা শীল (অষ্টম শ্রেণি)

"প্রকৃতি" - এমন একটি অনুভূতি যা কাউকে বলে প্রকাশ করা কঠিন। প্রকৃতিকে সব বলা যায়, কিন্তু তার কথা বলে শেষ করা যায় না। খোলাখুলি বলতে গেলে প্রকৃতির ভক্ত আমিও, কতটা প্রেমী হয়ে উঠতে পেরেছি জানি না। হ্যাঁ, তবে বলতে পারি অনেককিছু শিখেছি প্রকৃতির থেকে। একদিন আমার এক দিদিকে আমি বলেছিলাম- 'তোর জীবনটা আমার খুব পছন্দ। আমাকে শিখিয়ে দিবি কী করে এমনভাবে জীবন কাটানো যায় ?' তার উত্তরে দিদি বলেছিল-'ধুর পাগলি শিখতে হয় তো প্রকৃতি থেকে, জীবন থেকে , আমি তোকে শেখানোর কে?' কথাটা শুনে তখন রাগ করলেও এখন বুঝি প্রকৃতি থেকে সত্যি অনেক শেখা যায়। যখন কারোর থেকে কষ্ট পাই, তখন আকাশকে গিয়ে বলি। আকাশ আমার উত্তর দেয়- 'ঘন-কালো মেঘ তো আসবেই কিন্তু তুমি সাহস রাখো, আলো দেখতে কেউ তোমায় আটকাতে পারবে না। যখন কেউ আমায় অবহেলা করে তখন গাছে -র পাশে গিয়ে বসি। গাছ বলে-'তুমি আমায় জল দিতে ভুলে গেলে আমি কিন্তু তোমায় ফুল দিতে ভুলি না, তুমি নিজের পথে এগিয়ে যাও থেমে যেও না। এমন বাতাস থেকে তেজ, আগুন থেকে শক্তি, বৃষ্টি থেকে কোমলতা, মাটি থেকে ধৈর্য এমন অনেক কিছু শিখেছি। কতটা প্রকৃতির উপকার করতে পেরেছি জানি না, তবে ভালোবেসেছি অনেকটা। সম্মান করতে শিখেছি আমার ধরণীকে। নিজেকে প্রকৃতিপ্রেমী বলার মতো সাহস আমার নেই তবে এই আশা করব এমন ভাবেই যেন ভালোবাসতে পারি প্রকৃতিকে।

আমি প্রকৃতিপ্রেমী হতে চাই

আরোহান সেন (অষ্টম শ্রেণি)

"আজ বাঁচাও সবুজ, জাগাও সবুজ,
ঘোচাও হিংসার রেশ,
মনের সবুজ বাঁচলে তবেই
বাঁচবে এ পরিবেশ।"

প্রকৃতিতে ভালোবাসাটা আমার জ্ঞান হওয়ার পর থেকেই ছিল। তাই এখন, যখন আমি বড়ো হয়েছি তখনই বুঝতে পারি এই কবিতাটার অর্থ। ছোটোবেলা থেকেই আমার স্বভাব ছিল বাড়ির বাগান পরিষ্কার রাখা ও তার পরিচর্যা করা। আমার একটা স্বপ্ন ছিল, যে আমার একটা বাড়ি থাকবে, যেখানে কোনো কোলাহল নেই, দৈনন্দিন জীবনের ব্যস্ততা নেই এবং থাকবে প্রাণ ভরে নিশ্বাস নেওয়ার মতো দূষণমুক্ত পরিবেশ। থাকবে পাখিদের ডাকাডাকি আর পাহাড়ের কোল থেকে পড়ন্ত সূর্যের আলো উঁকি দেবে প্রকৃতিতে। আমার বাবা বলেন যে শুধু পড়াশোনা করে বই পড়লেই হয় না, প্রকৃত শিক্ষা পেতে হলে প্রকৃতির কোলে আসতে হয়। সেখান থেকেও শিক্ষা পাওয়া যায়। আমাদের যেমন আঘাত করলে অনুভূতি হয় তেমনই গাছেদেরও অনুভূতি আছে। আমাদের অমানবিকতার পরিচয় পাওয়া যায় গাছ কেটে বড়ো বড়ো বাড়ি তৈরি করার মধ্যে দিয়ে।
তাই আমি শহরে থাকলেও, আমি আমার স্বপ্ন পূরণ করার মধ্যে দিয়েও প্রকৃতির পরিচর্যা করতে চাই। যেখানে আমার পরিবারের সাথে সাথেও যেন পশু-পাখিরাও শান্তিতে স্বাধীনভাবে বসবাস করতে পারে। তাই আমি আমার লক্ষ্যে স্থির থাকবো এবং পাশাপাশি পড়াশোনাটাও মনোযোগ সহকারে করবো। আমি চাই আমার মতো যেন সবাই প্রকৃতির পরিচর্যাকেও নিজেদের জীবনে স্থান দেয়।

ভ্রমণকারী রূপে মেগাস্থিনিসের আবিষ্কার

অনোজ্জা চৌধুরী (নবম শ্রেণি)

বিখ্যাত ভ্রমণকারী, ইতিহাসবিদ এবং নৃতত্ত্ববিদ হিসাবে আমরা অবশ্যই মেগাস্থিনিসকে স্মরণ করতে পারি। মেগাস্থিনিস ছিলেন প্রথম ব্যক্তি যিনি লিখিতভাবে ভারতের ইতিহাসের বর্ণনা দিয়েছিলেন।

প্রাচীন গ্রীসের একজন বিখ্যাত পর্যটক, কূটনীতিক, ইতিহাসবিদ ও ভূগোলবিদ ছিলেন মেগাস্থিনিস। মেগাস্থিনিস সিরিয়ার রাজা সেলুকাস ১ এর রাজদূত হিসাবে ভারতীয় রাজা চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য্যের রাজদরবারে দায়িত্ব পালন করেন।

তাঁর ভারত ভ্রমণ সম্বন্ধে অনেক তথ্য জানা যায়। তিনিই সর্বপ্রথম প্রাচীন ভারতবর্ষকে তাঁর রচনার মাধ্যমে চিত্রিত করেছিলেন, তাই তাঁকে 'ভারতীয় ইতিহাসের জনক' বলা হয়। তিনি পেন্টাপটেমিয়া জেলা দিয়ে ভারতে প্রবেশ করেন, যার নদী সম্পর্কে তিনি অনেক কথাই বলেন।

সিন্ধু নদের পাঁচটি গুরুত্বপূর্ণ অংশের একটি ছিল এই নদী, যা পাঞ্জাব অঞ্চলের একাংশ গঠন করেছে। এই জেলা থেকে রাজপথ বরাবর যাত্রা করে তিনি পাটলিপুত্রে পৌঁছন। এরিয়ান ব্যাখ্যা করেন যে, মেগাস্থিনিস আরাকোশিয়াতে বসবাস করতেন এবং সেখান থেকেই ভারত ভ্রমণে আসেন।

চন্দ্রগুপ্ত মৌর্যের রাজত্ব কালে

মেগাস্থিনিস ভারত ভ্রমণে এসেছিলেন, কিন্তু তিনি কখন ভারতে এসেছিলেন বা তিনি কতদিন ভারতে ছিলেন তা অজ্ঞাত। মেগাস্থিনিস মৌর্য রাজধানী পাটলিপুত্রে ভ্রমণ করেছিলেন, তা নিশ্চিতভাবে বলা যায় না। মেগাস্থিনিসের বিবরণ অনুযায়ী, চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য তাঁর যে সেনাবাহিনী ও সাম্রাজ্য গড়ে তুলেছিলেন তারা সৈন্য, বলদ, ঘোড়া ও হাতির সরবরাহের উপর নির্ভরশীল ছিল।

তিনি রাজ্যের বিশালতা, মৌর্য প্রাসাদ এবং চন্দ্রগুপ্তের প্রশাসন দেখে বিস্মিত হয়েছিলেন।

মেগাস্থিনিস তাঁর "ইন্ডিকা " গ্রন্থে ভারতবর্ষ সম্পর্কে নিম্নলিখিত বর্ণনাগুলি করেছেন:

- ভারত একটি চতুর্ভুজাকৃতি দেশ, দক্ষিণ এবং পূর্বদিকে সমুদ্র দ্বারা বেষ্টিত।
- ভারতবর্ষে অনেক বৃহৎ এবং নৌযান চলাচলের উপযোগী নদী রয়েছে। যেগুলি উত্তর সীমান্তের পর্বত থেকে উৎপন্ন হয়েছে।
- ভারতবর্ষের মাটির নীচে সোনা, রূপা, তামা এবং লোহার খনি রয়েছে।
- ভারতে অত্যন্ত উর্বর সমভূমি রয়েছে এবং সেচের ব্যবস্থাও রয়েছে। প্রধান ফসলের মধ্যে রয়েছে ধান, বাজরা। গ্রীষ্ম এবং শীত উভয় সময় বৃষ্টিপাত হয় বলে বছরে দুটি ফসল চক্র রয়েছে। শীতকালে গম বপন করা হয়।

তবে তাঁর বর্ণিত দাসপ্রথা নিয়ে বিতর্ক আছে। এইভাবেই ভ্রমণকারী হিসাবে মেগাস্থিনিস ভারতের ইতিহাসে চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবেন।

ছন্দে লেখা ধাঁধাঁর মাঝে ছদ্মবেশে থাকা গুপ্তধনের খোঁজ

কোয়েল পাল (নবম শ্রেণি)

আতঙ্ক! দিগন্তের ওপারে গেলেই আমি মহাশূন্যে পড়ে যাব! আর একটা অলৌকিক ঘটনা, দিগন্তের কাছে দূরে চলে যাওয়া জাহাজের অদৃশ্য হওয়া, তীরের কাছে আসা জাহাজের দিগন্ত থেকে হঠাৎ দৃশ্যমান হওয়া! একি আশ্চর্য ঘটনা!

এটা ছিল সাহসিকতা প্রদর্শনের যুগ যখন নাবিকরা ইউরোপ থেকে অনেক সাহস নিয়ে সেই অতলস্পর্শ প্রতিকূল সমুদ্রের পাড়ি দিত যা কিনা হাজার জলের অনু সম্মিলিত হয়ে সেই নাবিকের বিরুদ্ধাচরণ করত।

ভাবনা, মনের উত্তেজনা, কৌতূহল প্রভৃতি নিয়ে নাবিকরা রহস্যময় দিগন্তের ধাঁধার উত্তর খুঁজে পেয়েছিলেন। ছোট নদী, ছোট জ্ঞানের পরিধি থাকবে? না, সেই পরিধি বৃদ্ধির জন্যই অনেক ধাঁধার উত্তরসূত্র পৃথিবীর মানচিত্রে দাগ কেটে দিয়ে গেছেন বিশিষ্ট নাবিক ক্রিস্টোফার কলম্বাস, ফার্দিনান্দ ম্যাগেলাম, বার্থোলোমিও ডিয়াজ, আমেরিগো ভেসপুচি, ফ্রান্সের, ইংল্যান্ডের অনেক নাবিক, ভাস্কো-দা-গামা প্রমুখ।

ভারত ছিল তখন সোনার দেশ। সেখানে যেতে পারলেই ব্যবসা, বাণিজ্য, জিনিসপত্র, আমদানি-রপ্তানি সব মিলিয়ে প্রচুর আয়। তাই এটা ছিল সেই গুপ্তধন যা আবিষ্কারের লোভে পড়েছিলেন নাবিকগণ। ভারতের তখন প্রচুর বিভিন্ন রকমের মশলা ও

নানা রত্ন ছিল। অলংকার ছিল যা খুব কম দামে পাওয়া যেত। ক্রিস্টোফার কলম্বাস পশ্চিম গোলার্ধ বরাবর যেতে গিয়ে আমেরিকাকে 'ওয়েস্ট ইন্ডিস' হিসাবে আবিষ্কার করেন এরপর আমেরিগো ভেসপুচি সেই 'ওয়েস্ট ইন্ডিস'-এ পৌঁছে অনুভব করেন যে এটা একটা নতুন ভূখণ্ড যা ভারতবর্ষ নয়। তার নাম দেওয়া হয় আমেরিকা। বার্থোলোমিও ডিয়াজ, পর্তুগিজ নাবিক, আফ্রিকার দক্ষিণ প্রান্ত (কেপ অফ গুড হোপ) ঘুরে ভারত ও এশিয়ার সমুদ্রপথ তৈরি করেছিলেন। এই ভাবেই ধীরে ধীরে নাবিকরা কল্পনা ভাবনার মাধ্যমে ধাঁধার উত্তর খন্ড করে জুড়তে লাগলেন। ঠিক সেই সময় ১৪৯৭ সালের ৮ জুলাই, পর্তুগিজ নাবিক ভাস্কো দা গামা ভারত আবিষ্কারের উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন। তিনি ১৪৯৮ সালের ২০ মে, কেরালার কোঝিকোড় জেলার কালিকটের কাপ্পাড় গ্রামে পৌঁছান। ভাস্কো দা গামার সমাধি কচিতে, কালিকট থেকে একটু দূরে। আর কালিকট থেকে তিনি তিনবার পর্তুগালে গেছেন এবং ফিরে এসেছেন। ভাস্কোদাগামা সমুদ্রপথে ভারতে আসার সহজ পথ খুঁজে ছিলেন এবং তিনি প্রথম ব্যক্তি যিনি ভারতে সমুদ্রপথে এসেছিলেন। তিনি ৯মাস ধরে কঠিন যাত্রার পর ভারতীয় ইউরোপের মধ্যে সমুদ্রপথ আবিষ্কার করেছিলেন। তিনি পর্তুগাল থেকে বেরিয়ে পশ্চিম গোলার্ধের দিকে না গিয়ে আফ্রিকার ধার বরাবর গিয়ে আফ্রিকার দক্ষিণ প্রান্ত পেরিয়ে দেখেন আটলান্টিক মহাসাগর এবং ভারত মহাসাগর মিলে গেছে এবং ভারত মহাসাগর বরাবর গিয়ে ভারতকে খুঁজে পান। ভারত ঠিক কোথায়? না জানার কারণে, তিনি প্রতিবার অন্যান্য মহাদেশ এবং দেশে পৌঁছেছিলেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত অন্ধকার গ্রাস করা সমুদ্রকে পেরিয়ে তিনি আলোয় ঝলমল করা ভারতীয় ভূখণ্ডকে আবিষ্কার করেছিলেন।

কিন্তু ভাস্কো দা গামা ইউরোপের ডাকাত, শাসক এবং ব্যবসায়ীদের জন্য একটি পথ তৈরি করেন। এরপর অনেক ইউরোপীয় ব্যবসায়ী এবং রাজা ভারত দখলের চেষ্টা করেছিলেন। পর্তুগালের লিসবনে ভাস্কো দা গামার নামে একটি স্মৃতিস্তম্ভ রয়েছে, যেখান থেকে তিনি ভারত যাত্রা শুরু করেছিলেন।

ডারউইন ও তার সমুদ্রযাত্রা

সৌরিক মুখার্জী (নবম শ্রেণি)

বিজ্ঞানকে কাজে লাগিয়ে মানুষ পৃথিবীর বহু সত্যকে উন্মোচন করেছে। পৃথিবীতে এমন কিছু দার্শনিক, বিজ্ঞানী জন্মেছেন যাদের অসাধারণ চিন্তাশক্তি ও উদ্ভাবনী ক্ষমতা প্রচলিত ধ্যানধারণাকে বদলে দিয়েছে। এমনই একজন মানুষ হলেন, ব্রিটিশ প্রকৃতিবিদ চার্লস ডারডইন। তাঁর বিবর্তন মতবাদ জীববিদ্যার এক নতুন দিগন্ত খুলে দেয়। পৃথিবীতে আজ এমন মানুষ খুঁজে পাওয়া শক্ত যে ডারউইন ও এইচ.এম্.এস্ বিগল নামক জাহাজে তাঁর পৃথিবী পরিভ্রমণ সম্পর্কে জানে না। ডারউইন তাঁর যাত্রার বর্ণনা ও অভিজ্ঞতা নিয়ে একটি বই লেখেন, যার নাম 'দ্য ভয়েজ অফ দ্য বিগল'।

১৮০৯ সালের ১২ই ফেব্রুয়ারি ডারউইন ইংল্যান্ডের শ্রপশায়ারের শ্রিউসবারিতে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। ছেলেবেলা থেকেই আশেপাশের প্রকৃতির প্রতি তাঁর একটা বিশেষ টান বা আকর্ষণ ছিল। অধিকাংশ সময়েই বনে-জঙ্গলে ঘুরে বেড়াতেন। নানা জাতের পোকামাকড়, ফড়িং, প্রজাপতি, পশুপাখির ছানা, গাছপালা, ফুল-ফল ইত্যাদি খুঁটিয়ে পর্যবেক্ষণ করতেন। প্রথমে ডারউইন এডিনবরায় ডাক্তারী পড়ার জন্য ভর্তি হন তবে ভালো লাগতো না। অবশেষে তিনি কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হলেন। সেখানকার উদ্ভিদবিদ্যার অধ্যাপক হেনস্লের প্রিয়পাত্র হয়ে উঠলেন ডারউইন। তাঁর সুপারিশেই ডারউইন বিগল জাহাজে তরুণ প্রকৃতিবিদ হিসাবে যোগ দিলেন। রবার্ট কিটজরয়ের নেতৃত্বে বিগল ১৮৩১ সালের ২৭ শে ডিসেম্বর ইংল্যান্ডের প্লাইমাউথ সাউন্ড বন্দর থেকে যাত্রা শুরু করে। (এটি ছিল বিগল-এর দ্বিতীয় সমুদ্রযাত্রা। প্রথম সমুদ্রযাত্রায় ডারউইন যোগদান করেননি)। ১৮৩২ সালে আফ্রিকা মহাদেশের পশ্চিম উপকূলে বিগল প্রথমবারের জন্য থামে। ওই বছরেই জাহাজ পৌঁছায় ব্রাজিলে। ব্রাজিলের নিরক্ষীয় বনভূমি তাঁকে মুগ্ধ করে। তিনি তাঁর সকল পর্যবেক্ষন ও গবেষণার কথা নিয়ে চিঠি ও দিনলিপি লিখতেন। অপরদিকে যেহেতু তিনি নবীন ছিলেন, তাই তিনি বিশেষজ্ঞদের মতামতের জন্য নমুনা সংগ্রহ করতেন। এরপর ১৮৩৩ সালে তার জাহাজ পৌঁছয় প্যাটাগোনিয়া এবং ফকল্যান্ড দীপপুঞ্জে। যেখানে তিনি স্বল্প পরিচিত মেগাথেরিম নামক এক প্রাণীর আবিষ্কার করেন। ১৮৩৪ সালে বিগল জাহাজ দক্ষিন আমেরিকার পশ্চিম উপকূলে চিলিতে পৌঁছায়। এখানে কিছুদিন থাকার পর জাহাজ আবার যাত্রা শুরু করে। ১৮৩৫ সালে বিগল ঘাঁটি গাড়ে প্রশান্ত মহাসাগরের বুকে গ্যালাপাগোস দ্বীপপুঞ্জে। এটি ছিল ডারউইনের জীবনের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা।

এই দ্বীপেই ডারউইন তার গবেষণার অধিকাংশ কাজ সম্পন্ন কারেন। তিনি গ্যালাপ্যাগোস দ্বীপপুঞ্জের ফিঞ্চ পাখি এবং কচ্ছপদের পর্যবেক্ষণ করে অভিযোজন, বিচ্ছিন্নতা ও প্রাকৃতিক নির্বাচন সম্পর্কে অনেক লেখালেখি করেন যা আজও পৃথিবী খ্যাত। তাঁর লেখা বহু প্রবন্ধে তিনি নিজেই স্বীকার করেন যে এই দ্বীপপুঞ্জে না এলে হয়তো তাঁর গবেষণার অনেকটা কাজ বাকি রয়ে যেত। এখানে বেশ কিছুদিন কাটানোর পরে ১৮৩৬ সালে তিনি নিউজিল্যান্ডের তাহিতিতে পৌঁছান এবং ওই বছরেই অস্ট্রেলিয়াতে গবেষণা চালান। এরপর মধ্যপ্রাচ্য হয়ে এইচ্. এম্.এস্ বিগল দীর্ঘ পাঁচ বছর পরে পুনরায় ইংল্যান্ডে ফিরে আসেন। এরপরই ডারউইন তাঁর লেখা গুলিকে জনমানসে প্রকাশ্যে আনেন এবং খ্যাতি অর্জন করেন। ডারউইনের এই সমুদ্রযাত্রা এটা প্রমাণ করে যে ভ্রমণও বিজ্ঞানের নানা আবিষ্কারের এক অবিচ্ছেদ্য অংশ।

দিগন্তের ওপারে:
একটি বিপথগামী যাত্রা

অরণি হালদার (নবম শ্রেণি)

অবাক লাগছে বুঝি শীর্ষকটি দেখে? যাত্রা, তা-ও আবার বিপথগামী? আর এমন কী-ই বা আছে এই বিপথগামী যাত্রায়, যে সে কাহিনি আজ ভাগ্যক্রমে আপনার চোখের সামনে? আচ্ছা, আমরা বেড়াতে গেলে কোথায় যাই সাধারণত ? তীর্থস্থান, পাহাড়, সমুদ্র, প্রাচীন সৌধ- এমন কত কিছু! কিন্তু এরকম কি শুনেছেন যে বৈজ্ঞানিক আশ্চর্য দেখতে মানুষ ছুটেছে দেশ-বিদেশে? কোথাও খসে পড়ছে উল্কাখন্ড, কোথাও আগ্নেয়গিরি থেকে চুঁইয়ে পড়ছে তরল ম্যাগমা- কোথাও চুনাপাথরের গুহায় অজস্র স্ফটিক সূঁচের মতো খাড়া হয়ে আছে; কোথাও মাইলের পর মাইল সাদা প্রান্তর, কোথাও বা খোলা মাঠে আগুনের কুন্ডলি!- এসবকে কী বলব? ঐশ্বরিক লীলা? তবে তার যে একটা বিজ্ঞানসম্মত কারণও আছে, তা জানলে আনন্দটা লাফিয়ে চারগুণ হয়ে যায় না?

এত বড়ো ভূমিকাটা কেন দিলাম, জানেন? ওই যে, আমার রচনার শীর্ষকের ব্যাখা দিতে! যুগে যুগে মানুষ কত কিছুই না আবিষ্কার করেছে। - করেছে পৃথিবী পরিভ্রমণ, আবার কেউ করেছেন দুটিই। ভাস্কো-দা-গামা, ফার্দিনান্দ ম্যাগেলন-এর নাম তো শুনেই থাকবেন। তবে আজ, আমি লিখব এক অন্যরকম ভ্রমণ বিবরণ- 'ক্রিস্টোফার কলম্বাসের দুর্ঘটনাজনিত আবিষ্কার।' আজ আমরা জানব কীভাবে ভারতের মশলা আমদানির উদ্দেশ্যে বের হয়ে কলম্বাস আবিষ্কার করে ফেলেছিলেন আজকের 'ওয়েস্ট ইন্ডিজ'। ভারতবর্ষের সুগন্ধি ও সুস্বাদু মশলায় সুঘ্রাণ শুধু কোনো ক্লান্ত গৃহিণীর পাকশালাতেই থেমে থাকেনি। তা পৌঁছেছিল সুদূর ইউরোপে। ইউরোপীয়রা তখন ভারতবর্ষকে 'ইস্ট ইন্ডিজ' বলেই চিনতেন। আর এই 'ইস্ট ইন্ডিজ'-এর মশলার সম্ভার অকর্ষিত ও আগ্রহী করে ইউরোপিয়ান 'সাহেব'-দেরকে। এই মশলার সন্ধানেই চিরকাল ভারত ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার দ্বীপপুঞ্জগুলিতে পাড়ি দেওয়ার প্রচেষ্টা চালিয়ে গিয়েছে। তবে, ইউরোপ থেকে ভারতে আসার কোনো জলপথ তাদের জানা ছিল না।

কলম্বাস অবশেষে, স্প্যানিশ রানি ইসাবেলাকে রাজি করিয়ে, ১৪৯২ খ্রিস্টাব্দে স্প্যানিশ রাজকীয় পৃষ্ঠপোষকতায় 'নিনা', 'পিন্টা' ও 'সান্তা মারিয়া' নামক তিনটি জাহাজ নিয়ে আটলান্টিক সাগরে যাত্রা করেন। শুরু হয় এক রোমাঞ্চকর অভিযান।

১৪৯২ খ্রিস্টাব্দ, তারিখটি ছিল ১২ ই অক্টোবর। ক্রিস্টোফার কলম্বাস সান্তা মারিয়ার ডেকে দাঁড়িয়ে, আটলান্টিকের লবণাক্ত ঝাপটা তাঁর মুখে লাগছে। তার চোখ দিগন্তের দিকে স্থির-ছিল। কয়েক মাস ধরে তিনি সমুদ্রেই ছিলেন। তাঁর তিনটি জাহাজ অবিরাম ঢেউয়ের সঙ্গে লড়াই করছিল। তাঁর ক্রু-রা ফিসফিসিয়ে বলছিলেন যে তাঁরা 'ইস্ট ইন্ডিজ'- এ যাওয়ার পশ্চিমমুখী পথ খোঁজার চেষ্টা ত্যাগ করবেন। কিন্তু কলম্বাস, তাঁর দৃষ্টিভঙ্গিতে অটল বিশ্বাস রেখে এগিয়ে গেলেন। ঝলমলে রৌদ্রতপ্ত সকাল। হঠাৎ এক প্রহরীর কাছ থেকে চিৎকার

ভেসে এলো। -"ল্যান্ড হো!" ক্লান্ত ক্রুরা উল্লাসে ফেটে পড়লেন। তাঁরা অবশেষে খুঁজে পেয়েছেন- উদীয়মান সূর্যের সোনালী আভায় স্নান করা একটি সবুজ দ্বীপ। আবিষ্কারের রোমাঞ্চে কলম্বাসের হৃদয় স্পন্দিত। বালুকাময় তীরে তিনি পা রাখলেন। দ্বীপটির নামকরণ করলেন সালভাদোর, এই বিশ্বাসে যে তিনি ভারতে পৌঁছেছিলেন। অবশ্য তিনি ভুল ছিলেন, তিনি এক নতুন পৃথিবীর মুখোমুখি হয়েছিলেন। এমন এক পৃথিবী, যা ইউরোপীয়দের কাছে ছিল দিগন্তরেখার অপর পারে। কারণ এই দ্বীপটি পূর্বের ভারত ছিল না, বরং পশ্চিমের আমেরিকার অন্তর্গত বাহামা দ্বীপ ছিল। এই ভারতীয়দের গায়ের বর্ণ যেন অন্যরকম লাল। কলম্বাস এদেরকে ডাকলেন 'রেড ইন্ডিয়ান'। আমেরিকান অধিবাসীরা এইভাবে 'রেড ইন্ডিয়ান' নামটি পেল।

কলম্বাস যখন সেখানকার দ্রব্যাদি ও রেড ইন্ডিয়ানদেরকে নিয়ে স্পেনে পৌঁছোন, রাজা ফার্দিনান্দ ও রানি ইসাবেলা তাঁকে অনন্দিতচিত্তে বরণ করে নেন। এভাবেই ইউরোপের সঙ্গে আরেকটি মহাদেশ আমেরিকার যোগসূত্র স্থাপিত হল।

'ইস্ট ইন্ডিজ' বা ভারতবর্ষ আবিষ্কার করতে গিয়ে 'ওয়েস্ট ইন্ডিজ' আবিষ্কার করে ফেললেন ক্রিস্টোফার কলম্বাস!

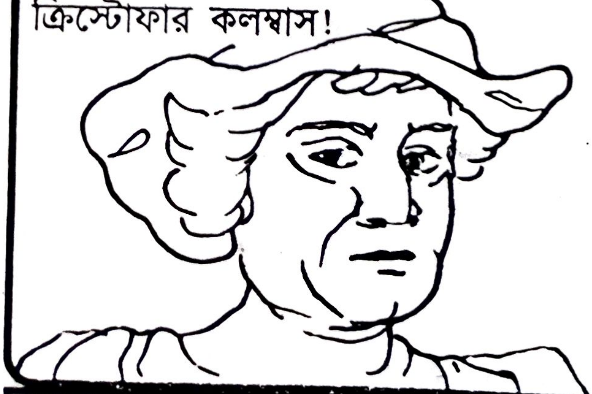

ক্যাপ্টেন, স্কটের দক্ষিণীমেরু অভিযান

দেবস্মিতা মিশ্র (দশম শ্রেণি)

জ্ঞানপিপাসু মানুষ তার জ্ঞানের ভাণ্ডার সমৃদ্ধ করতে, অজানাকে জানতে পাড়ি দিয়েছে নানা স্থানে। কেউ ফিরেছে ব্যর্থতার স্বাদ বুকে নিয়ে আবার কেউ ফিরেছে বিজয়রথে। 'ডিসকভারি অভিযান'-এর ইচ্ছে পূরণে অনাবিষ্কৃত স্থানের উদ্দেশে রওনা দিয়েছে মানুষ। এদের মধ্যেই রবার্ট ফ্যালকন স্কট উল্লেখযোগ্য। তিনি আমাদের কাছে ক্যাপ্টেন স্কট নামেই পরিচিত। ভ্রমণ পিপাসু মানুষেরা তাঁর নাম শুনেছেন। তবে কে ছিলেন ক্যাপ্টেন স্কট? কেন তিনি এত জনপ্রিয়?

১৮৬৮ সালে ৫ই জুন ইংল্যান্ডের ডিভনশায়ারের এক গ্রামে স্কট জন্মগ্রহণ করেন। পরিবারে নৌ ও সামরিক অভিযান বিদ্যমান ছিল। সেই সূত্রে তিনিও জন্মগ্রহণ করেন সমুদ্রের প্রতি টান নিয়ে। বাল্যকাল থেকেই জাহাজের কাজ শিখেছিলেন। পরবর্তীতে কিশোর বয়সেই স্কট জাহাজের কাজে লেগে সমুদ্রযাত্রা করেন। 'রয়েল নেভি অফিসার' হিসেবেই তাঁর কর্মজীবনের সূচনা হয়। ১৮৯৯ সালে, 'রয়েল জিওগ্রাফিক্যাল সোসাইটি'র সভাপতি, স্যার ক্লেমেন্টস মার্কহ্যামের সাথে তাঁর আকস্মিক সাক্ষাৎ হয় এবং তিনি একটি পরিকল্পিত অ্যান্টার্কটিক অভিযানের কথা জানতে পারেন। স্কট এই অভিযানের অধিনায়কত্ব গ্রহন করেছিলেন। এমতাবস্থায় দক্ষিণ মেরু আবিষ্কার নিয়ে পৃথিবীবাসীর মনে সুপ্ত আকাঙ্ক্ষার বীজ বপন হচ্ছিল।

১৯০১ সাল, স্কট ও তাঁর দল ইংল্যান্ড থেকে দক্ষিণ মেরুর দিকে যাত্রা শুরু করেন। স্কটের প্রধান সঙ্গী, নাবিক স্যার আর্নস্ট স্যাকলটন। দুর্লঙ্ঘ্য বরফের প্রাচীর দক্ষিণ মেরুকে মানুষের লালসা থেকে লুকিয়ে রেখেছিল। ক্যাপ্টেন স্কট ও তাঁর সঙ্গীরা সেই প্রাচীর অতিক্রম করতে না পেরে কিং এডওয়ার্ড দ্বীপে নোঙর ফেলে থেকে গেলেন। কিছু মাস কাটিয়ে পুনরায় নভেম্বর (১৯০২) মাসে শ্লেজযাত্রা করে দক্ষিণ মেরু পৌঁছতে উদ্যত হলেন। ক্যাপ্টেন স্কট, স্যাকলটন, উইলসন -এই তিন জন সঙ্গে উনিশটি কুকুর যাত্রী হলেন। কিন্তু বাধ সাধল প্রকৃতি। প্রকৃতি আরও উচ্ছৃঙ্খল, অশান্ত হয়ে উঠে তার সম্পদকে রক্ষা করতে থাকল। বরফের স্তর ক্রমশ ঘনীভূত হতে থাকে। তুষার ঝড় তীব্র রূপ নেয়। ফলতঃ পুনরায় তাঁরা আবার কিং এডওয়ার্ড দ্বীপে ফিরে আসতে বাধ্য হলেন। কয়েক মাস পর আবার সঙ্গী ইভানস ও লাসলিকে নিয়ে স্কট পুনরায় যাত্রা করেন এবং ব্যর্থ হন। ব্যর্থতাকে মেনে নিয়েই তাঁরা ইংল্যান্ডে, ফিরে আসার সিদ্ধান্ত নিলেন। কিন্তু পুরু বরফের স্তর ফিরে যাওয়ার রাস্তাটিকেও অবরোধ করে দিয়েছে। কিন্তু প্রকৃতি যেন এবার সত্যিই তাঁদের অভিযানেও শামিল হতে চেয়েছিল। দ্রুতই বরফের প্রাচীর গলে গিয়ে যাতায়াতের পথ তৈরী হল। তবে এবার তাঁরা ছিলেন দক্ষিণমেরু থেকে মাত্র ৪৬৩ মাইল দূরে। পরবর্তীতে, ১৯০৮ সালে স্যার আর্নেস্ট স্যাকলটন নিজের দল নিয়ে যাত্রা করলে ৯৭ মাইল দূরত্বের ব্যবধানে ফিরে আসেন।

এরপর দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হন ক্যাপ্টেন স্কট। ১৯১০ সালের জুন মাসে 'টেরানোভা' জাহাজে চেপে দক্ষিণ মেরুর দিকে যাত্রা করেন। প্রাকৃতিক দুর্যোগের সাথে মোকাবিলা করে শেষে ১৯১২ সালে ১৮ ই জানুয়ারি তাঁরা জীবনের আকাঙ্ক্ষিত দেশের মাটিতে পৌঁছন। কিন্তু পৌঁছে দেখেন, আমুন্ডসেন, নরওয়ের বিখ্যাত আবিষ্কারক তাঁর বিজয়রথ আরোহণ করে কিছু সপ্তাহ পূর্বেই দক্ষিণ মেরু আবিষ্কার করে চলে গেছেন।

কিন্তু ফেরার পথে প্রকৃতির বুকে জীবন সঁপে দেন স্কট। মৃত্যুর অব্যবহিত পূর্বক্ষণে ডায়রির শেষ পাতায় লেখেন- "গত একমাস আমরা যে কষ্ট পেয়েছি, আমি ভাবতে পারি না, কোনো মানুষ কোনোদিন সেরকম কষ্ট সহ্য করেছে কিনা। তবুও আজ ভাগ্যের বিরুদ্ধে আমার কোনো নালিশ নেই, যা পেয়েছি তা মাথা পেতে গ্রহণ করেছি। যদি আমরা বেঁচে থাকতে পারতাম, তাহলে সমস্ত ইংল্যান্ড শুনতে পেত যে, ইংল্যান্ডের গৌরবের জন্য তাঁর কয়েকজন সন্তান কী কষ্টই না সহ্য করেছে - আমাদের এই মৃতদেহ আর আমার এই লেখা হয়তো জগতে একদিন সে কাহিনির সাক্ষ্য দেবে--"

হ্যাঁ, সত্যিই, তাঁদের এই অসাধ্যসাধন শুধু ইংল্যান্ডকে নয়, সমগ্র বিশ্ববাসীকে ভাবিত করে। তাঁদের এই জয়যাত্রা সত্যিই গর্বের। ব্যর্থতার সঙ্গে যে জয় এক সুতোতেই বাঁধা তা তাঁদের এই জয়যাত্রা থেকেই স্পষ্ট।

হিউয়েন সাঙ

সৌরদীপ্তা সাহা (দশম শ্রেণি)

হিউয়েন সাঙ ছিলেন একজন বিখ্যাত চীনা বৌদ্ধ ভিক্ষু, পণ্ডিত, পর্যটক এবং অনুবাদক। ভারতে হর্ষবর্ধনের শাসনকালে হিউয়েন সাঙ বৌদ্ধ ধর্মের মূল সুর সন্ধানের উদ্দেশ্যে ভারতে এসেছিলেন। তৎকালীন ভারত ও চৈনিক বৌদ্ধধর্মের মধ্যে যোগসূত্র স্থাপনে তিনি অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছিলেন। সমগ্র চীন যখন অধর্মে অন্ধকারাচ্ছন্ন, তখন ভারতের বৌদ্ধ ধর্মের বিষয়ে জ্ঞান অর্জন করে, বিভিন্ন গ্রন্থ রচনা করে এবং চীন তথা ভারতে বৌদ্ধ ধর্ম প্রচারের মাধ্যমে তিনি এই অবস্থার মোকাবিলা করেন।

হিউয়েন সাঙ, লুজহু প্রদেশের গৌসি টাউনের চিনহি গ্রামে ৬০২ খ্রিস্টাব্দে একটি সম্ভ্রান্ত ও উচ্চশিক্ষিত পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর প্রকৃত নাম ছিল 'চেন তুই'। ছোটোবেলা থেকেই বৌদ্ধ ধর্মের প্রতি তিনি আকৃষ্ট ছিলেন। ১৩ বছর বয়সেই তিনি বৌদ্ধ ধর্মে দীক্ষিত হন। ২০ বছর বয়সে, যখন তিনি সন্ন্যাসী হলেন তখন তাঁর নাম হল 'হিউয়েন সাঙ'। বৌদ্ধধর্মচর্চার সময় সংস্কৃত থেকে চৈনিক ভাষায় অনূদিত ধর্মগ্রন্থগুলি পড়তে তাঁকে বিভিন্ন সমস্যার মুখে পড়তে হয়েছিল। কারণ এই অনুবাদ গুলি সম্পূর্ণ সঠিক ছিল না। তিনি ধর্মচর্চায় এতই মগ্ন হয়ে গিয়েছিলেন যে একদিন তিনি ভারত ভ্রমণের স্বপ্নাদেশ পান। স্বপ্ন দেখার পরেই তিনি ভারত যাওয়ার জন্য ব্যাকুল হয়ে ওঠেন। তবে যখন হিউয়েন সাঙ চীনের সম্রাট 'তাইজং'-এর কাছে অনুমতি চাইলেন তখন চীনা সম্রাট তাঁকে অনুমতি দিলেন না। অনেক মানুষ তাঁকে দুর্গম এবং অত্যন্ত উষ্ণ পথ অতিক্রম করে ভারতে যেতে বারণ করেছিল। কিন্তু এর উত্তরে তিনি জানান-

" আমি পূর্বে থাকার চেয়ে, পশ্চিমে গিয়ে মরতে রাজি।"

২৭ বছর বয়সে লুকিয়ে চীন থেকে পালিয়ে তিনি ভারতে আসেন। তবে এই যাত্রাপথ ছিল অত্যন্ত কণ্টকাকীর্ণ। গোবি মরুভূমি পার করার সময় ধুলোর ঝড় তাঁকে দিকভ্রষ্ট করে দেয়। অত্যন্ত উচ্চ উষ্ণতায় তার শরীরও খারাপ হয়ে পড়ে। এরপর তিনি 'সিল্ক রুট'-এর মধ্য দিয়ে ভারতের কাশ্মীরে এসে পৌছান। 'বিনিতপ্রভা', 'চন্দ্রবর্মন' এবং 'জয় গুপ্ত' ছিলেন হিউয়েন সাঙ-এর ভারত দর্শক যাঁরা তৎকালীন ভারতের বিশিষ্ট জ্ঞানী ব্যক্তি ছিলেন। ঐ সময় মগধের ন্যায় কাশ্মীরও বৌদ্ধ ধর্মের এক বিশেষ কেন্দ্র ছিল। এরপর তিনি উত্তর ভারতে বিভিন্ন স্থান পরিদর্শন করেন। বৌদ্ধ ধর্মের অনুসন্ধানে তিনি লুম্বিনি, কুশিনগর, সারনাথ এবং গয়াতে গিয়েছিলেন। ধর্মের প্রতি এই নিষ্ঠা থাকার জন্যই তাঁকে 'Prince of Pilgrims' বলা হয়। ভারতে আসার চার বছর পর নিজের জ্ঞানপিপাসা মেটাতে তিনি 'নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়'-এ ভর্তি হন। এই বিশ্ববিদ্যালয়ের আচার্য শীলভদ্রের তিনি সর্বোত্তম শিষ্য ছিলেন। শীলভদ্র, হিউয়েন সাঙ-এর নাম দিয়েছিলেন 'মোক্ষদেব '। মগধরাজ হর্ষবর্ধনেরও প্রিয়পাত্র ছিলেন তিনি। তিনি বিভিন্ন গ্রন্থে তাঁর ভারত ভ্রমণের অভিজ্ঞতা

লিপিবদ্ধ করেছেন।
হর্ষবর্ধনের শাসন প্রণালী, ভারতের শিক্ষাব্যবস্থা এবং সর্বোপরি বৌদ্ধ ধর্মের আদর্শ তাঁর লেখনিতে স্থান পেয়েছে। ১২ বছর ভারত ভ্রমণের পর সিন্ধু নদ পেরিয়ে তিনি চিন পৌঁছন। পথে তাঁর অনেক বই নষ্ট হয়ে যায়। চীন থেকে পলায়ন করে ভারতে এলেও তিনি নির্ভয়ে সেখানে প্রত্যাগমন করেন। কারণ তিনি চীনের অন্ধকার দূর করতে চেয়েছিলেন। তাঁর গ্রন্থের নাম 'সি-ইউ-কি', অর্থাৎ 'পশ্চিমে যাত্রা', এতে বলা হয়েছে চীনে, ভারত 'ইন-তু' নামে খ্যাত। চৈনিক ভাষায় 'ইন-তু'-এর অর্থ চাঁদ। কারণ সেই সময় ভারতীয়রা নিজেদের জ্ঞানালোকের মাধ্যমে সমগ্র বিশ্বকে আলোকিত করে তুলছিল।
ভারত তথা চিনের ইতিহাসে' হিউয়েন সাঙ'-এর নাম উজ্জ্বল অক্ষরে লেখা আছে। তিনি একজন বৌদ্ধ ধর্ম প্রচারকই ছিলেন না, তিনি ছিলেন একজন বিশিষ্ট ভ্রমণকারী। তাঁর লেখনি ভারতের ইতিহাস রচনায় বেশ উপযোগী।

হিলারি ও নোরগের অবিস্মরণীয় অভিযান

অয়ন্না বিশ্বাস (দশম শ্রেণি)

নেপাল ও তিব্বত সীমান্তে অবস্থিত হিমালয় পর্বতমালার তথা পৃথিবীর সর্বোচ্চ শৃঙ্গ মাউন্ট এভারেস্ট (৮৮৪৮ মিটার, মতান্তরে ৮৮৫০ মিটার)।

১৯২১ সালে একটি ব্রিটিশ অভিযানের মাধ্যমে এভারেস্টে আরোহনের প্রথম প্রচেষ্টা করা হয়। তাঁরা তিব্বত মালভূমি পেরিয়ে ৪০০ মাইল পথ অতিক্রম করে পর্বতের পাদদেশে পৌঁছালেও প্রচন্ড ঝড়ের কারণে ফিরে আসেন। এভাবে ১৯২২ সালে দ্বিতীয়বার ও ১৯২৪ সালে তৃতীয়বার ব্রিটিশ অভিযান শুরু হলেও ব্যর্থ হয়। ১৯৫২ সালে একটি সুইস অভিযানে দুই পর্বতারোহী রেমন্ড ল্যাম্বার্ট এবং তেনজিং নোরগে খুম্বু আইসফলের দক্ষিণ শৃঙ্গে পৌঁছান, কিন্তু সরবরাহের অভাবে ফিরে আসেন।

সুইস অভিযানের সাফল্য দেখে ১৯৫৩ সালে কর্নেল জন হান্টের নেতৃত্বে বৃহৎ ব্রিটিশ অভিযানের আয়োজন করা হয়। সেরা ব্রিটিশ পর্বতারোহী এবং অভিজ্ঞ শেরপাদের নির্বাচন করে দুটি দলে বিভক্ত করা হয়-
i) প্রথম দল- চার্লস ইভান্স এবং টম বোর্ডিলন
ii) দ্বিতীয় দল-এডমন্ড হিলারি এবং তেনজিং নোরগে

১৯৫৩ সালের ২৬শে মে চার্লস ইভান্স এবং টম বোর্ডিলন এভারেস্টের চূড়ায় পৌঁছানোর অভিযান শুরু করেন। চূড়া থেকে ৩০০ ফুটের মধ্যে পৌঁছন, কিন্তু খারাপ

আবহাওয়া ও একটি অক্সিজেন সেট ত্রুটিপূর্ণ হওয়ার কারণে ফিরে আসতে হয়।

২৮শে মে, তেনজিং নোরগে এবং নিউজিল্যান্ডের মৌমাছি প্রতিপালনকারী এডমন্ড হিলারি ২৭,৯০০ ফুট উঁচুতে শিবির স্থাপন করে ৬:৩০ মিনিটে যাত্রা শুরু করেন। এক ঠাণ্ডা, নিদ্রাহীন রাতের পর সকাল ৯টা নাগাদ দক্ষিণ শিখরে পৌছান। প্রায় এক ঘন্টা পরে ৪০ ফুট উঁচু একটি খাড়া পাথুরে ধাপের মুখের মধ্যে একটি ফাটল ধরে হিলারি পথ খুঁজে পান। এটি পরবর্তীকালে হিলারি ধাপ (Hilary's Step) নামে পরিচিত হয়। সকাল প্রায় ১১:৩০ মিনিটে তাঁরা দুজনে বিশ্বের সর্বোচ্চ স্থানে পৌছান, কিন্তু অক্সিজেন সরবরাহের সমস্যার জন্য মাত্র ১৫ মিনিট তাঁরা সেই অধরা সৌন্দর্যকে অর্থাৎ মাউন্ট এভারেস্টের চূড়া থেকে পৃথিবীর রূপকে উপভোগ করতে পেরেছিলেন।

হিলারি ও নোরগের ঐতিহাসিক সাফল্যের খবর অভিযানের বেস ক্যাম্প নামচে বাজারে এবং লণ্ডনে রানী দ্বিতীয় এলিজাবেথের কাছে পৌছে যায়। এই সাফল্য শুধুমাত্র নির্দিষ্ট কয়েকটি দেশের আনন্দের বিষয় নয়, সারা পৃথিবীর আনন্দের বিষয়।

হঠাৎ যখন বৃষ্টি আসে

রিয়া বাড়ৈ (ষষ্ঠ শ্রেণি)

দিনটা ছিল শ্রাবণ মাসের সোমবার, সকাল বেলা ঘুম ভেঙেই আকাশ কালো মেঘে ঢেকে এসেছে। সত্যিই ঘড়ি না দেখলে বোঝাই যাচ্ছিল না ওটা সকাল নাকি সন্ধ্যা। চারিদিকটা থমথম করছে। মনে মনে ঠিক করেই নিলাম আজ স্কুল যাব না। মাকে বললাম সেকথা, কিন্তু মা বলল পরীক্ষা সামনে। তাই স্কুল যেতেই হবে। আমার মন তখন গাইতে শুরু করেছে - 'আয় বৃষ্টি ঝেঁপে, ধান দেব মেপে'। কিছুদিনের মধ্যেই শুরু হল শ্রাবণধারা, টিপটিপ ফোটা পরিণত হল বড়ো বড়ো জলকনায়। জানলার ধারে বসে বৃষ্টির ঠান্ডা বাতাস উপভোগ করতে লাগলাম। যতদূর দেখা যায় দেখে নেওয়ার সাধ। বর্ষার অঝোর ধারায় চারিদিক ঝাপসা হয়ে এল। কিছুই দেখা যাচ্ছে না। হঠাৎ আজকে স্কুলে ছুটি পাওয়া গেল কিন্তু বন্ধুদের দেখা নেই সবাই আজকে বৃষ্টিবন্দি। মনে পড়ে গেল ছোটোবেলার সেই কবিতা।

'বৃষ্টি পড়ে টাপুরটুপুর নদে এল বান,
শিব ঠাকুরের বিয়ে হল তিন কন্যা দান'।

নদে বান এসেছে কিনা জানি না। কিন্তু নর্দমাগুলো ভেসে গেছে। পাড়ার সব দোকান বন্ধ। রাস্তায় কোনো লোক নেই। মার কথা শুনে স্নান করে নিলাম। আজ মেনুতে ছিল খিচুড়ি, বেগুনী, ডিম ভাজা ও পাপড় ভাজা। বৃষ্টির দিনে খিচুড়ি খাওয়ার মজাটাই আলাদা। দুপুর থেকে বিকেল গড়িয়ে এল কিন্তু বৃষ্টির ছুটি নেই।

হঠাৎ যখন বৃষ্টি আসে

প্রেয়সী দাস (ষষ্ঠ শ্রেণি)

সকাল থেকে কিন্তু দিনটা মোটেই ভালো ছিল না। সকালেও সেদিন আমার ঘুম ভেঙেছিল মুখের ওপর এসে পড়া আলতো রোদের আঁকিবুকিতে। চারপাশে সকালের ব্যস্ততা ও শব্দ। বারান্দায় কাগজওয়ালার সাইকেলের ঘন্টির শব্দ, রাস্তায় বাজারমুখী তপনকাকুর চটির ফটাস ফটাস শব্দ, রান্নাঘরে চায়ের জল ফোটার শব্দ-সবমিলিয়ে সকালটা অন্য আর পাঁচটা দিনের মতোই ছিল কর্মমুখর। কিন্তু ন-টা বাজতে না বাজতেই আকাশ একেবারে আঁধার করে এলো। দিনটা ছিল রবিবার। তাই সেদিন স্কুলে যাওয়ার তাড়া ছিল না। আমি আমার আঁকার খাতাটা নিয়ে আঁকতে বসে গেলাম। আপন মনে এঁকে চলেছি- কালো হয়ে আসা আকাশ, আর তার গায়ে ঘনিয়ে ওঠা জলভরা মেঘ। হঠাৎ মা বলল আকাশ ঘনিয়ে উঠেছে, আমি একবার আকাশের দিকে তাকালাম। তখন হঠাৎ ঝেঁপে বৃষ্টি নামল। তখন খাতা, রং সরিয়ে জানলায় ধারে গিয়ে বসলাম। জানলায় বসেই দেখছি, রাস্তার লোকগুলো দৌড়োদৌড়ি করছে, কেউ ছাউনি খুঁজে বেড়াচ্ছে। কিছু লোক, এ-দোকানের ছাউনি, ও-বাড়ির রোয়াকে গিয়ে আশ্রয় নিল। দেখতে দেখতে রাস্তায় এক হাঁটু জল হয়ে গেল।

আমার বৃষ্টি দেখা তখনও শেষ হয়নি। মা তাড়া লাগিয়ে স্নান সেরে আসতে বললেন। নিতান্ত অনিচ্ছায় জানলার ধার ছেড়ে উঠলাম। খেতে

বসে দেখি গরম গরম খিচুড়ি আর সঙ্গে কতরকম ভাজা। মনটা আবার খুশি হয়ে গেল। সত্যিই তো, এমন শিরশিরে ঠান্ডা বৃষ্টির দিনে খিচুরি হলে আর কী চাই। এদিকে সারাদিন বৃষ্টি থামার কোনো লক্ষণ নেই। এইবার আমার একটু একটু মনখারাপ হতে লাগল। বিকেলের আলোটা সরে আসছে। আর তার মধ্যে সেই একঘেয়ে বৃষ্টি - কখনও টিপটিপ করে, কখনও ঝমঝমিয়ে - চলছে তো চলছেই।

কোমলশাখা: বিদ্যালয়ের সান্ধ্যকালীন অবৈতনিক বিদ্যালয়। নিয়মিত পাঠচর্চার পাশাপাশি তারা বৈকালিক খেলাধুলা ও সংস্কৃতিচর্চার স্বাদ পায়।

হঠাৎ যখন বৃষ্টি আসে

টিঙ্কু সাহা (ষষ্ঠ শ্রেণি)

হঠাৎ করে যখন বৃষ্টি আসে, তখন প্রকৃতি যেন এক নতুন রূপে ধরা দেয়। রোদের তেজ কমে যায়, আর বাতাসের মধ্যে একটা নতুন তরতাজাভাব আসে, এই হঠাৎ বৃষ্টির সময়, প্রকৃতির বিভিন্ন দিক এক নতুন রূপে প্রকাশ পায়। বৃষ্টির প্রথম ফোঁটাগুলো হালকাভাবে পড়ার সময়, বাতাসের মধ্যে একটা ঠাণ্ডা এবং সতেজ অনুভূতি তৈরি হয়। চারপাশের দৃশ্যগুলো যেন আরও বেশি জীবন্ত হয়ে ওঠে। গাছের পাতাগুলো বৃষ্টির ফোঁটা দিয়ে ঝলমল করে, আর রাস্তাগুলো চকচক করতে থাকে। বৃষ্টির শব্দও খুব সুন্দর। ফোঁটাগুলো ছাদের উপর বা গাছের পাতায় পড়ার সময়, একটা শান্ত এবং আরামদায়ক শব্দ তৈরি হয়। এই শব্দ মানুষের মনকে শান্ত করে এবং এক অন্যরকম অনুভূতি দেয়।

[সভার মতে: শিক্ষাক্ষেত্রে শিক্ষার্থীর আচরণ পরিবর্তনের জন্য শাস্তি প্রদানের কোনো ভূমিকা নেই। (পক্ষে)]

প্রার্থিতা দাস- নবম শ্রেণি

শিক্ষাক্ষেত্রে দুটি প্রধান চরিত্র হল শিক্ষক / শিক্ষিকা এবং শিক্ষার্থী। এক্ষেত্রে বলে রাখা ভালো শিক্ষার উদ্দেশ্য হল কৌশল ও বিশেষজ্ঞতার মাধ্যমে একজন ভালো মানুষ অথবা একজন ভবিষ্যতের সুনাগরিক তৈরি। তো এক্ষেত্রে হয়তো শাস্তির প্রয়োজন কোথাও-কিছু ক্ষেত্রে আছে যা আমরা অস্বীকার করতে পারি না, কিন্তু মনে রাখা দরকার অনেক ক্ষেত্রেই শাস্তি দেওয়ার ফলাফলটা স্বল্প মেয়াদী। অর্থাৎ হয়তো যে কাজের জন্য শিক্ষার্থী শাস্তি পেল, পরে শিক্ষার্থী আবার সে কাজেরই পুনরাবৃত্তি ঘটালো, হ্যাঁ হতে পারে সেটা সবার পিছনে, লুকিয়ে অথবা জেদের বশে সকলের সামনে। এর কারণ? কারণ হল সে অনুধাবন-ই করল না যে আমার ভুলটা ঠিক কোথায়!! সে হয়তো জানে যে সে সেই কাজটা করেছে সেটা ভুল এবং সে শাস্তি পেয়েছে। কিন্তু যেন এটাই অনুধাবন করল না যে আমার কাজটা ঠিক না ভুল, আমার দোষটা আসলে কোথায়?! আবার অনেক ক্ষেত্রে তো এমন ও দেখা যায় যে শাস্তি পেয়ে সে যখন বোঝার চেষ্টা করতে চায় এবং প্রশ্ন করে যে, "আমি কী অন্যায় করেছি? কেন আমাকে শাস্তি দেওয়া হল?" তখন কিন্তু তার সে ভুলটার ব্যাখ্যা করার বদলে উল্টে তাকে একপ্রকার ধমক দিয়েই চুপ করিয়ে দেওয়া হয় যে-"না তুমি ভুল করেছ, তুমি এটা করবে না, তোমার প্রশ্ন করার কোনো অধিকারই নেই! কারণ তুমি দোষী!" কিন্তু যদি এমনটা না করে তাকে ব্যাখ্যা করা হত যে তার কাজটা কেন ভুল বা এই কাজে কার কতটা ক্ষতি তাকে যদি আরেকবার অনুধাবন করার সুযোগ দেওয়া হত, তাহলে হয় এমন ঘটত না। প্রসঙ্গত বলে রাখি শাস্তি এবং সংশোধন কিন্তু সম্পূর্ণ ভিন্ন।

যুক্তিখণ্ডন:-

পূর্ববর্তী বক্তা বলল যে শাস্তির অভাবে সমাজের একাংশ ক্রমেই উচ্ছৃঙ্খল কাজ করতে অভ্যস্ত হয়ে যাচ্ছে এবং ঘৃণ্য থেকে ঘৃণ্যতম কাজ করতে উদ্যত হচ্ছে। তো এই বিষয় আমার প্রশ্নটি হল সেটা কী সত্যি? এই সমস্তটাই কী শুধুমাত্র শাস্তির অভাবে?? আমার মতে হয়তো না। আমার মতে এমনটা হচ্ছে guidance এর অভাবে। যারা এইসব নোংরা কাজ করছে, তারা হয়তো এমন একটা পরিবেশে বেড়ে উঠেছে, এমন একটি সমাজে বেড়ে উঠেছে যেখানে তাদের Guide করার মতো কেউ ছিল না। ঠিক-ভুলের পার্থক্যটা বুঝিয়ে দেওয়ার মতো কেউ ছিলনা। তারা হয়তো জানে যে এই কাজটা ভুল বা এই কাজটা ঠিক কিন্তু কেন ঠিক বা কেন ভুল অথবা এতে তার এবং গোটা এই সমাজটার কী ক্ষতি তা তাকে কেউ ব্যাখ্যা দেয়নি।

আরেক পূর্ববর্তী বক্তা বললো যে জীবনে চলতে কিছু নিয়মকানুন প্রয়োজন এবং তা না মানলে শাস্তি আবশ্যক। তো ওর প্রথম বক্তব্যটি সমর্থন জানিয়ে বলছি জীবনে কিছু নিয়ম তো অবশ্যই দরকার, কিন্তু তা না মানলে শাস্তিই কেন? নিয়ম লঙ্ঘন করলে শাস্তিই কেন পেতে হবে? বরং তার বদলে যদি বলা হয় যে এই নিয়ম না মানলে তোমার এই-এই ক্ষতি হতে পারে অথবা এই-এই বিপদ হবে, তাহলেও তো হয়।

তাই আমার মতে শাস্তি নয় বরং তার বদলে Realisation -এর সুযোগ দেওয়া হোক। কেউ ভুল করলেই তার দিকে আঙুল তুলে বারংবার "তুমি ভুল! তুমি দোষী!" না বলে বরং তাকে বলা উচিত যে, "না তুমি ভুল নও। তুমি যে কাজটি করেছ সেটি ভুল" এবং কেন ভুল তা বুঝিয়ে দেওয়া হোক।

[সভার মতে: শিক্ষাক্ষেত্রে শিক্ষার্থীর আচরণ পরিবর্তনের জন্য শাস্তি প্রদানের কোনো ভূমিকা নেই। (বিপক্ষে)]

অদ্রিজা জানা - দশম শ্রেণি

• প্রথমত, বিভিন্ন বয়সে শিক্ষার্থীদের মানসিক বিকাশ জ্ঞান-বুদ্ধি দ্বারা বিভিন্ন ঘটনা বিশ্লেষণ করে দেখার দক্ষতার পার্থক্য হয়। ফলত, বিভিন্ন বয়সে শিক্ষার্থীদের আচরণ সংশোধনের পদ্ধতিও পৃথক হওয়াই কাম্য।

একটি উদাহরণ দেওয়া চলে। একজন শিশু শিক্ষার্থী শ্রেণিকক্ষে পাঠে অমনযোগী হলে শিক্ষক বা শিক্ষিকা তাকে নম্রভাবে বুঝিয়ে তার এই আচরণ সংশোধন করতে পারেন। কিন্তু বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষার্থীরা যত পরিণত হয়, তাদের মধ্যে এই বোধের বিকাশ ঘটে যে, পাঠে অমনযোগী হলে আমার নিজেরই ক্ষতি হবে। তৎসত্ত্বেও সে যদি পাঠে অমনযোগী হয়, তবে সেই আচরণ তার অবাধ্যতার পরিচয় বহন করে। তাই এক্ষেত্রে তার আচরণ সংশোধনে শাস্তিদান ব্যতীত অন্যান্য উপায় বিশেষ কার্যকর হবে না বলেই মনে হয়।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, শাস্তিদান মানেই কিন্তু কটূক্তি বা শারীরিক প্রহার নয়।

• দ্বিতীয়ত শাস্তিদান করা হয়, শিক্ষার্থীর ভ্রান্ত আচরণ সংশোধনের উদ্দেশ্যে। এমনকি শিক্ষার্থীর অবচেতন মনকে ভ্রান্ত কাজ করা থেকে বিরত রাখতে অনেক সময় বাধ্য হয়েই শাস্তি প্রদান করতে হয়। যাতে ভবিষ্যতে অবচেতন মনে সেই ভ্রান্ত কাজটির পুনরাবৃত্তি ঘটানোর পূর্বে শিক্ষার্থী আরও দু-বার ভেবে দেখে। এরপর শিক্ষার্থী যখন ধীরে ধীরে পরিণত হবে, সে নিজেই নিজের ভুলটি বুঝতে পারবে।

• তৃতীয়ত, শাস্তিদান মানেই ভীতিপ্রদর্শন নয়। শাস্তিদান মানে শিক্ষার্থীকে বুঝিয়ে দেওয়া যে, সে একটি অন্যায় করেছে এবং অন্যায়ের সঙ্গে আপোস না করাই শ্রেয়।

• এক্ষেত্রে বলা প্রয়োজন, শাস্তিদানের নেপথ্যেও থাকে ভালোবাসা ও স্নেহ। কারণ শাস্তিদাতা শিক্ষার্থীর ভালো চান বলেই শাস্তিদান করেন। তাই আমার বিপক্ষীয় বক্তাদের মন্তব্যে উঠে আসা-'শাস্তির পরিবর্তে ভালবাসা দ্বারা আচরণ সংশোধন'
কথাটি বোধ করি ঠিক নয়।

• আমার মনে হয়, শিক্ষার্থীরা যদি শাস্তি দানকে ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গিতে গ্রহণ করে, তবে একাধারে আত্মমর্যাদায় আঘাত লাগার ফলে সে যেমন নিজে থেকে নিজের ভ্রান্ত আচরণ সংশোধন করতে পারবে, তেমনই অন্যায়ের সঙ্গে আপোস না করার মহৎ শিক্ষাটিও তার মধ্যে অঙ্গীভূত হবে।

• কোনও রকম লিখিত বয়ানের উপর ভিত্তি না করেই বলছি, -আমাদের পিতা-মাতা, শিক্ষক-শিক্ষিকাদের ছাত্রজীবন এবং আজকের শিক্ষার্থীদের জীবন তুলনা করলে বেশ কয়েকটি বিষয় স্পষ্ট হয়ে ওঠে। শিক্ষার্থীদের শাস্তিদানের হার কমিয়ে এনে আজকের ছাত্রসমাজে সামাজিক ব্যাধি, উচ্ছৃঙ্খলতা, অবক্ষয় এক অংশেও কমেছে কি?

মাননীয় বিচারকেরা নিজেদের অভিজ্ঞতা দ্বারা তা অবশ্যই বিচার করে দেখবেন।

তাই যারা আজকের সভার মতের পক্ষে নানা যুক্তি পেশ করছেন, তারা বোধ করি বাস্তবের দিকে চোখ না রেখে পরিকল্পনা তথা কল্পনার জগতেই বেশি ভেসে রয়েছেন।

• তবে আমি আশাবাদী, শিক্ষার্থীদের শাস্তিদান করাকে আজ যাঁরা অযৌক্তিক বলে মনে করছেন, তাঁরা নিশ্চয় একদিন বুঝবেন গুরুজনেরা আমাদের ভালোর জন্য, আমাদেরকে এই ঝঞ্ঝাবিক্ষুব্ধ পৃথিবীর সামনে এক-একজন সুস্থ ব্যক্তিত্বসম্পন্ন মানুষ হিসেবে গড়ে তোলার জন্যই শাস্তিদান করে থাকেন। তখন অবশ্যই গুরুজনদের কাছে তারা স্বীকার করবেন-

"এখনো প্রাণের স্তরে স্তরে
তোমার দানের মাটি সোনার ফসল তুলে ধরে।"

তাই পরিশেষে প্রশ্ন রেখে যাই, সর্বক্ষেত্রে শিক্ষার্থীর আচরণ সংশোধনে শাস্তি না দিয়ে, শুধুমাত্র বোঝাপড়ার ভিত্তিতে তার অন্যায়গুলির মীমাংসা করলে শিক্ষার্থীর ব্যক্তিত্বে কোনও অসম্পূর্ণতা থেকে যাবে না তো?

মাকে যা যা বলতে চাই

পৃথা ভট্টাচার্য (তৃতীয় শ্রেণি)

মা হলো পৃথিবীর সবচেয়ে প্রিয় ও আপন একজন মানুষ। আমি যখন বুঝতে শিখেছি তখন আমি দেখেছি আমার মায়ের অক্লান্ত পরিশ্রম। আমার মা আমাকে সবসময়ে আগলে রাখে ও আমার চাওয়া আবদার গুলো পূরণ করার চেষ্টা করে। আমার যখন শরীর খারাপ হয় তখন আমার মা তাঁর খাওয়া, ঘুম ভুলে রাত জেগে আমার সেবাযত্ন করে। তাই আমার মনের মধ্যে আমার মাকে নিয়ে অনেক কথা আছে। যা আমি আমার মাকে বলতে চাই। প্রথমেই আমি আমার মাকে বলতে চাই, 'মা আমি তোমাকে খুব ভালোবাসি'। আমি মাঝে মাঝে আমার মায়ের অবাধ্য হয়ে পড়ি। এরজন্য আমি আমার মাকে বলতে চাই, 'মা তুমি আমাকে ক্ষমা করে দেবে'। আমার মা সকাল থেকে রাত পর্যন্ত অক্লান্ত পরিশ্রম করে। এরজন্য আমি আমার মাকে বলতে চাই, 'মা তুমি একটু বিশ্রাম নাও। আর কত ঘাম ঝরাবে?' তোমার যদি কিছু হয়ে যায় তাহলে আমি বড্ড একা হয়ে পড়ব ও জীবনে বড়ো হতে পারব না। এরজন্য আমি আমার মাকে বলতে চাই, 'মা তোমাকে সুস্থ থাকতে হবে আমার জন্য'। আমি যখন ছোটো ছিলাম তখন আমি খুব অসুস্থ ছিলাম। তাই তখন আমার মা তাঁর স্বপ্ন পূরণ করতে পারেনি। এরজন্য আমি আমার মাকে বলতে চাই, 'মা আমি বড়ো হয়ে ঠিক একদিন না একদিন তোমার স্বপ্নপূরণ করব। আর তোমার পরিশ্রম যাতে কখনও বিফলে না যায় তারও চেষ্টা করব আমি এবং আমি যাতে মানুষের মতো মানুষ হয়ে তোমার মুখ উজ্জ্বল করতে পারি তারও চেষ্টা করব আমি। তুমি শুধু আমার মাথায় তোমার আশীর্বাদের হাত বাড়িয়ে রেখো মা'।

নদীমাতৃক এই দেশ

কিশলয় গঙ্গোপাধ্যায় (চতুর্থ শ্রেণি)

নদী যার মাতার ন্যায়, অর্থাৎ নদী দ্বারা যে দেশ উর্বরা ও শস্যসমৃদ্ধ তাকেই নদীমাতৃক দেশ বলা হয়।

গঙ্গা, ব্রহ্মপুত্র, যমুনা, সিন্ধু, নর্মদা, কৃষ্ণা ইত্যাদি বড়-বড় নদ-নদী ছাড়াও ভারতের নানা অংশের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হয়েছে আরও ছোটো-ছোটো নদ-নদী।

"আমাদের ছোটো নদী চলে বাঁকে বাঁকে"- এরকমই অসংখ্য ছোটো বড়ো নদ-নদী সুদূর অতীত থেকে ভারতবাসীর জীবনধারার ওপর গভীরভাবে প্রভাব বিস্তার করেছে। শুধুমাত্র সিন্ধু নদ তীরবর্তী হরপ্পা-মহেঞ্জোদাড়োর মতো প্রাচীন সভ্যতা নয় বা গঙ্গাতীরবর্তী এলাহাবাদ বা বারাণসীর মতো প্রাচীন ধর্মস্থান নয়, আধুনিক ভারতের শহর, নগর, জনপদ গড়ে উঠেছে কোনও না কোনোও নদীর তীরে।

জীবিকার ক্ষেত্রেও দেখা যায় বর্তমানে দেশের শতকরা ৬০ থেকে ৭০ জন অধিবাসি কৃষিকাজের উপর নির্ভরশীল। দেশের খাদ্য-বস্ত্রের উৎপাদন ও অর্থনীতিও বহুলাংশে কৃষি নির্ভর।

সকল জীবিকার মেরুদণ্ড হিসেবে পরিচিত লৌহ-ইস্পাত শিল্প করার জন্য প্রচুর জলের প্রয়োজন হয়, যে কারণে এই শিল্প নদীর পার্শ্ববর্তী অঞ্চলেই গড়ে উঠেছে। এছাড়া অন্যান্য কিছু শিল্প যেমন -কার্পাস বয়ন শিল্প, চিনি শিল্প, পাট শিল্প ইত্যাদি কৃষিভিত্তিক শিল্পগুলিও পরোক্ষভাবে নদীর উপর নির্ভরশীল।

দেশের জলসেচ ব্যবস্থা পরিচালনায় এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে দেশের নদ-নদীগুলি। দেশে বৃষ্টিপাতের অনিশ্চয়তা ও সীমাবদ্ধতার কারণে নদ-নদীগুলি থেকে সরাসরি বা খালের মাধ্যমে জল সেচ ব্যবস্থা পরিচালিত হয়।

অভ্যন্তরীণ সুলভ জলপথে দেশের পরিবহন ব্যবস্থা পরিচালিত হয়।

পানীয় জলের এক বিরাট অংশ আসে নদ-নদী থেকে।

জল বিদ্যুৎ উৎপাদনও নদ-নদী থেকেই হয় যা দেশের শক্তি চাহিদার এক বিরাট অংশ পূরণ করে থাকে।

ভারতের জীবনধারার সাথে এদেশের নদ-নদীএতই ওতপ্রোত ভাবে জড়িত, নদ-নদীর বুকে কান পাতলে যেন ভারতেরই হৃদয়ের স্পন্দন শোনা যাবে। নদ-নদী গুলি যেন ভারতীয়দের মায়ের মত সন্তানস্নেহে লালন-পালন করে চলেছে। তাদের জীবন ধারাকে আরো পরিপুষ্ট করে চলেছে। তাই আমার দেশ ভারত অবশ্যই একটি নদীমাতৃক দেশ।

বই-এর কোন চরিত্রের সাথে যদি হঠাৎ দেখা হয়

সঙ্গিনী দাস (পঞ্চম শ্রেণি)

রোমাঞ্চকর, দুঃসাহসিক অভিযান মূলক বই পড়তে আমার ছোট থেকে বেশ ভালো লাগে। তাই আমার পঞ্চম শ্রেণির বাংলা পাঠ্যবই 'পাতাবাহার' -এর বিভিন্ন গল্পের মধ্যে আমার প্রিয় গল্প হল শিবশঙ্কর মিত্রের "মধু আনতে বাঘের মুখে"। আর এই গল্পের প্রধান চরিত্র হলো 'ধনাই'। কল্পনার রাজ্যে যদি আমার সাথে হঠাৎ ধনাইয়ের দেখা হয় তাহলে আমার প্রথম ইচ্ছা হবে যে, তারা তাদের সুন্দরবনের মধু সংগ্রহ করার দুঃসাহসিক অভিযানে আমাকে তাদের সঙ্গী করে। সুন্দরবনে যাওয়ার ইচ্ছা আমার ছোটবেলা থেকেই। সুন্দরবন যাবার আমার ছোট থেকে ইচ্ছা, সুন্দরবনের ম্যানগ্রোভ অরণ্য, রয়েল বেঙ্গল টাইগার, বিরল জীব বৈচিত্র্য, গাছগাছালি, নদী, খাঁড়ি, জলপথ তথা সুন্দরবনের অপরূপ প্রাকৃতিক দৃশ্য আমায় মুগ্ধ করে, যদি সত্যিই কখনো ধনাইয়ের সাথে দেখা হয় তাহলে আমি তার সাথে শীতের শেষে সুন্দরবন যাব, তার দুই বন্ধু আর্জন ও কুফিলের মতো মধু সংগ্রহ করার দুঃসাহসিক আভিযানে সঙ্গী হব। নিজের চোখে আমি দেখবো তারা কীভাবে সুন্দরবনের গভীর অরণ্যের মধ্যে মধু সংগ্রহ করে। সুন্দরবনের মধু সারা পৃথিবী বিখ্যাত। এপ্রিল, মে মাসে মধু সংগ্রহ করার সেরা সময়। মধু যারা সংগ্রহ করে তাদের মোউলি বলে। আমি একদিনের জন্য মোউলি হয়ে, তাদের সাথে মধু সংগ্রহ করতে চাই আর ধনাইয়ের কাছ থেকে শিখে নেব মৌমাছি তাড়ানোর মন্ত্র। পর্যটন, বিজ্ঞান, গবেষণা তথ্য ও তত্ত্বের ভান্ডার, ঐতিহ্যবাহী অরণ্য সুন্দরবন, শুধু বাংলার নয়, সারা পৃথিবীর গর্ব। এই কল্পনার রাজ্যে ধনাইয়ের সাথে আমি ডিঙি পার হয়ে, সুন্দরী, গরান, হেতাল পাঠ্যবইয়ে পড়া ম্যানগ্রোভ অরণ্য শ্বাসমূল ও ঠেসমূল দেখব, এই কল্পনার জগতে আমি ধনাইয়ের সঙ্গী হয়ে তাদের সাথে সুন্দরবনে মধু সংগ্রহের দুঃসাহসিক অভিযানের সাক্ষী হতে চাই।

কৈশোরের নানা সু-অভ্যাস

ঐশানী শীল (ষষ্ঠ শ্রেণি)

'জন্মিলে মরিতে হবে
অমর কে কোথা রবে'

সত্যিই পৃথিবীর প্রতিটি জীবের ক্ষেত্রেই এটি সত্য। পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ জীব আমরা অর্থাৎ মানুষও এই ছন্দেই আবদ্ধ। আমাদের এই ক্ষণস্থায়ী জীবন নিজেকে বয়স অনুসারে চারটি পর্যায়ে বিভক্ত করেছে। যথা শৈশব, কৈশোর, যৌবন ও বার্ধক্য।

এই পর্যায়সমূহের মধ্যে কৈশোর পর্যায়টি জীবনের প্রথম পর্যায়, শৈশব এবং তৃতীয় পর্যায় যৌবনের মধ্যে সেতুবন্ধনকারী পর্যায়। প্রতিটি মানুষের জীবনে কৈশোর পর্যায়টি অতীব গুরুত্বপূর্ণ এই কারণেই যে এটি জীবনের সবচেয়ে সুন্দর, কোমল, চিন্তাহীন আদুরে নরম তুলতুলে। শৈশব পর্যায়ের সাথে জীবনের সবচেয়ে কঠিন, রূঢ়, বাস্তব, আবেগহীন যৌবন পর্যায়ের মেলবন্ধন ঘটায়। কাজেই এই কৈশোর পর্যায়টিই প্রতিটি মানুষের জীবনে নিজেকে সঠিকভাবে গড়ে তোলার সঠিক সময়কাল। এবং একজন মানুষ নিজেকে তখনই সঠিক ভাবে গড়ে তুলতে পারে যখন সে সুশৃঙ্খলা এবং সু-অভ্যাসের মধ্য দিয়ে জীবন অতিবাহিত করতে পারে।

কৈশোর পর্যায়ের বয়স সীমা মূলত ১২ বছর থেকে প্রায় ১৯ বছর পর্যন্ত। এই বয়স সীমাকে অন্য শব্দে বলে বয়সন্ধিকাল বা Adolescence Period আবার teenagerও বলা হয়ে থাকে। এই বয়স সীমার প্রতিটি বালিকা ও বালকের মধ্যে শারীরিক এবং মানসিক নানা ধরনের পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়। এই পর্যায়ের ছেলে-মেয়েদের কাছে পৃথিবীটা যেন একটু ভিন্ন রঙে ধরা পড়তে থাকে। কাজেই কৈশোর পর্যায়ের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টি হলো সু-অভ্যাস যার মাধ্যমে একজন কিশোর বা কিশোরী তার যৌবন বয়সে মানুষের মত মানুষ হয়ে উঠতে পারে। এই সকল সু-অভ্যাস গুলির মধ্যে প্রথম সু-অভ্যাসটি হল-

* সঠিক শিক্ষা গ্রহণের মাধ্যমে নিজেকে পারদর্শী করে তোলা। আর এই শিক্ষা গ্রহণ কেবলমাত্র পড়াশোনার মাধ্যমেই নয় খেলাধুলা, গান বাজনা, অঙ্কন, অভিনয়, নৃত্যকলা বিভিন্ন ধরনের হাতের কাজ যা ভবিষ্যৎ জীবনে অর্থনৈতিকভাবে সহযোগিতা করতে পারবে।

* দ্বিতীয়ত সময়ানুবর্তিতা অর্থাৎ সময়ের কাজ সময়ে করা; পরে বলে ফেলে না রাখা।

* তৃতীয়ত আমরা যেহেতু সমাজবদ্ধ জীব তাই সমাজের প্রতিটি মানুষের সঙ্গে সভ্য সামাজিক ব্যবহার করা। স্থান কাল পাত্র ভেদে আচরণ করা। কোন মানুষকে ছোট না করা।

* চতুর্থত গুরুজনদের সকল আদেশ, পরামর্শগুলিকে মেনে চলা।

* পঞ্চমত কৈশোর পর্যায়টি যেহেতু বয়সন্ধিকাল তাই নিজের শরীর মন ও স্বাস্থ্যকে সুস্থ সুন্দর রাখার জন্য গুরুজনদের দেওয়া উপদেশগুলোকে মান্যতা দেওয়া।

* ষষ্ঠত এই বয়স কালের ছেলেমেয়েরা নানা ধরনের বদ অভ্যাসের সম্মুখীন হতে পারে। তাই এই বদ অভ্যাসগুলি কে নিজের থেকে দূরে রাখার জন্য গুরুজনদের দেওয়া উপদেশ পরামর্শগুলোকে মানা ও তার সঠিক প্রয়োগ করা।

* সপ্তমত সর্বদা সত্যি কথা বলা কখনোও মিথ্যা কথা না বলা।

* অষ্টমত গুরুজনদের কাছ থেকে কোন বিষয় গোপন না করা।

* নবমত সর্বদা পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা মেনে চলা।

* দশমত অন্যের সাফল্যে ঈর্ষান্বিত না হওয়া এবং অন্যের ব্যর্থতায় ব্যঙ্গ না করে নিজেকে প্রস্তুত করা।

* একাদশতম হল অন্যের সমালোচনায় নিজেকে ব্যস্ত না করা এবং নিজেকে অন্যের সমালোচনার বিষয়বস্তু না করে তোলা।

* দ্বাদশত নিজের ব্যর্থতায় ভেঙে না পড়া, চেষ্টা করতে থাকা। কারণ মনে রাখা দরকার-"Failure is not the opposite of success, it is a part of Success".

ঘটনাচক্রে এই ষষ্ঠ শ্রেণি থেকেই সকলের জীবনে কৈশোর পর্যায়ের শুরুর ঘন্টা বাজে। কাজেই এই বয়সের প্রতিটি বালক ও বালিকার উল্লেখিত সু-অভ্যাস গুলির মাধ্যমে জীবন অতিবাহিত করা উচিত।

সত্য কথা বলতে আমাদের বিদ্যালয়ে মেধা প্রদর্শনীতে প্রবন্ধ প্রতিযোগিতায় ষষ্ঠ শ্রেণির জন্য এই বিষয় নির্বাচন যেন আমাদের সেই ঘন্টার ধ্বনিটিকে শোনার ক্ষেত্রে অনেকটাই সজাগ করে তুলল।

সবশেষে আশা রাখি কৈশোর জীবনের সকল সু অভ্যাসগুলিকে জীবনের ধ্রুবতারা করে, এগিয়ে চলতে পারলে জীবনের পরবর্তী দুটি পর্যায়কে কিছুটা হলেও নিষ্কন্টক করতে পারব।

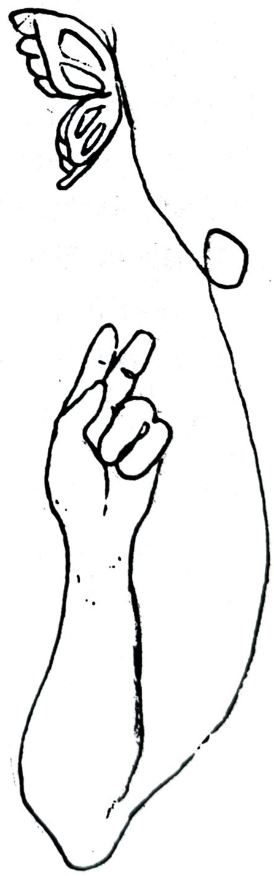

শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্য গঠনে স্বাস্থ্যকর খাবার

প্রিয়ান চক্রবর্তী (সপ্তম শ্রেণি)

"সবাই জানে সবাই বোঝে,
স্বাস্থ্য সুখের মূল।
সুষম খাবার খেতে তোমরা
করনা কেউ ভুল"

সূচনা: স্বাস্থ্য হল মানুষের নীরোগ অবস্থা যা শারীরিক, মানসিক এবং সামাজিক তিনদিক থেকেই আমাদের ভালো থাকাই হল সু-স্বাস্থ্যের পরিচয়। সুস্বাস্থ্য বজায় রাখতে গেলে বিশেষ কিছু খাদ্যাভ্যাস মেনে চলতে হবে। স্বাস্থ্য ভালো থাকলেই মানুষ সবরকম কাজ খুব সহজেই সম্পন্ন করতে পারে। কারণ কথায় আছে, "স্বাস্থ্যই হল আমাদের সম্পদ"-[Health is our Wealth]

স্বাস্থ্যকর খাবারের ভূমিকা: স্বাস্থ্যকর খাবারের অপর নাম সুষম খাবার। আমাদের জীবনে স্বাস্থ্যকর খাবারের অবদান অনেক। স্বাস্থ্যকর খাবারের মধ্যে আমরা ৮টি খাদ্য উপাদান বিশেষত খাদ্যতন্তু, কার্বোহাইড্রেট, ভিটামিন, প্রোটিন ও প্রচুর পরিমান জল পেয়ে থাকি। নিয়মিত নানা রকমের ফল, শাকসবজি, ছোটো মাছ দুধ আমাদের খাওয়া উচিত। যা আমাদের শারীরিক স্বাস্থ্যকে উন্নত করে। স্বাস্থ্যকর খাবারের আমাদের জীবনে ভূমিকা হল নিম্নরুপ-

রোগ প্রতিরোধ করা: স্বাস্থ্যকর খাবার পর্যাপ্ত পরিমান গ্রহণ করলে শরীরের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা সুদৃঢ় হয় ও এরফলে আমরা যে কোনো দুরারোগ্য ব্যাধি যেমন- ক্যানসার, জন্ডিস, যক্ষ্মা প্রভৃতির সাথে লড়তে পারি। স্বাস্থ্যকর খাবার পর্যাপ্ত পরিমাণ গ্রহণ করলে আমাদের শরীরের বিভিন্ন অঙ্গ যেমন ফুসফুস, বৃক্ক, হৃদপিণ্ড, মস্তিষ্ক ভালো থাকে।

পুষ্টি উপাদান সরবরাহ: স্বাস্থ্যকর খাদ্য থেকে আমরা প্রয়োজনীয় পুষ্টি উপাদান সংগ্রহ করি যা আমাদের দেহের বৃদ্ধি ও বিকাশে সহায়তা করে। বাড়ির তৈরি করা সুষম খাদ্য আমাদের শরীরের জন্য ভালো। এর জন্য আমাদের সর্বদা বাড়ির খাবার খাওয়া উচিত। রাস্তার বিভিন্ন (Junk food)-এ ভেজাল মেশানোর জন্য তা আমাদের শরীরের জন্য একেবারেই ভালো নয়। বাইরের খাবার বেশি খেলে হৃৎপিন্ডের সক্রিয়তা, ফুসফুস ক্ষতিগ্রস্থ হয় ও আমাদের স্থূলত্বের সম্ভাবনা বৃদ্ধি হয়। (Dopamin) হরমোন ক্ষরন হয় যা ভবিষ্যতের জন্য একেবারেই ভালো নয়। তাই সুস্বাস্থ্যের অধিকারী হিসেবে গড়ে তুলতে হলে সুষম আহার গ্রহণ করতে হবে।

মানসিক স্বাস্থ্য গঠনে স্বাস্থ্যকর খাবার: মানসিক স্বাস্থ্য গঠনে স্বাস্থ্যকর খাদ্যের ভূমিকা অনেক। অটিজম, ডিপ্রেশন, ডিসলেক্সিয়া প্রভৃতি রোগ নির্মূল করতে পর্যাপ্ত পরিমাণ সুষম আহার গ্রহণ করতে হবে। আমাদের সুস্থ মনের অধিকারী হিসাবে গড়ে তুলতে হবে।

উপসংহার: স্বাস্থ্য হল সম্পদ। অন্যান্য সম্পদের মতো স্বাস্থ্যকে রক্ষা করার দায়িত্ব ও কর্তব্য উভয়ই আমাদেরই। নিয়মিত ব্যায়ামচর্চা ও সুষম আহার গ্রহণই আমাদের সু-স্বাস্থ্য গঠনে সহায়তা করবে। নইলে ভবিষ্যতে আমাদের শরীরের উপরই তার কুপ্রভাব পড়বে।
তাই সর্বশেষে বলাবাহুল্যই যে-

"স্বাস্থ্য হল মোদের ধন,
স্বাস্থ্যকে রক্ষা করা খুবই প্রয়োজনে।"

মানুষ হয়ে মানুষের পাশে দাঁড়াও

কোয়েল পাল (অষ্টম শ্রেণি)

ভূমিকাঃ পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ উন্নততর জীব হল মানুষ। হাজার হাজার বছর ধরে মানুষ তার কর্মের দ্বারা আজ এই অবস্থায় এসে পৌঁছেছে। হাজারও মৃত মানুষ তার কর্মের দ্বারা আজীবন অমরত্ব লাভ করেছে। তবে পৃথিবীতে মানুষেরই কিছু কর্মের জন্য সে পিছিয়ে পড়ছে। মনে রাখতে হবে মান এবং হুঁশ যে বা যার মধ্যে থাকে তাদেরকেই মানুষ বলা হয়। কিন্তু মানুষ তার শ্রেষ্ঠ গুণগুলি হারিয়ে ফেলছে। পৃথিবীতে হাজারও মানুষ একলা হয়ে পড়ছে মানুষেরই জন্যে। আমাদের তাদের পাশে গিয়ে দাঁড়ানো উচিত।

মানবতা কী?ঃ মানবতা হল মানুষের শ্রেষ্ঠ গুণগুলি বা বৈশিষ্ট্যগুলি যা মানুষের মধ্যে থাকা প্রয়োজন। যেমনঃ দয়া, মায়া, ভালোবাসা, সহযোগিতা, সমানুভূতি, নিস্বার্থপরতা সবকিছুই হল -মানুষের ধর্ম। কিন্তু মানুষ তার এই মানবতাই দিনে দিনে হারিয়ে ফেলছে। মানুষের মনে মানুষই জন্ম দিচ্ছে লোভ, লালসা, রাগ, স্বার্থপরতা এসব। এসব দিয়ে মানুষ কিন্তু উন্নতির পথে চলতে পারবে না।

মানুষের এখন কী অবস্থা?ঃ মানুষ এখন একলা অসহায় দুঃখের ভিড়ে মিশে যেতে বসেছে। সমাজের কিছু অংশ মানুষের ঠিক এইরকম অবস্থা। এখন প্রশ্ন ওঠে, এর জন্যে কে দায়ী? এর জন্যে মানুষই দায়ী। মানুষ লোভে নিজের স্বার্থ চরিতার্থ করতে অন্য মানুষকে বঞ্চিত করছে। আমরা জানি যে মানুষের প্রকৃত বৈশিষ্ট্য এটি নয়। তাই এখন প্রকৃত বৈশিষ্ট্য সম্পন্ন মানুষকে খুঁজতে হবে।

মানুষ কেন এত দুঃখিত ও একলা?ঃ আমরা সব মানুষই এক। সব মানুষের ধমনীতে লাল রক্তই বইছে। কিন্তু আজকালকার মানুষ অন্য মানুষকে কোনো জাতি, দেশ, ধর্মের একটি তকমা এঁটে দিয়েছে, যাতে করে মানুষ সেই ক্ষুদ্র তক্‌মার বাইরে অন্য কোন কিছু নিয়ে ভাবে না। সেই তক্‌মার গণ্ডির মধ্যে মানুষ আটকে গেছে। বাইরের পরিবেশ সম্বন্ধে তার জ্ঞানটুকু নেই। যেমনঃ কোন দেশের সঙ্গে অন্য কোনো দেশের যুদ্ধ হলে, দুটি দল ভিন্ন দেশের নাগরিক হলেও তারা কিন্তু উভয়েই মানুষ। রাজনীতিবিদরা যতই মুখে বলুক যে গ্রাম বাংলার মানুষদের তারা সাহায্য করবে, অনেক টাকা অনুদান দেবে, কিন্তু সামান্য কারণে তারা মধ্যবিত্ত বাড়ির কোনো সদস্যকে তারা অপমান না করে ছাড়েনি। এছাড়াও বেকার ছন্নছাড়া ব্যক্তি যারা চাকরি পায় না, জীবিকাহীন তাদের মধ্যে প্রচলিত জ্ঞান বুদ্ধিটুকু আছে যা সাধারণত সেই লোভী, স্বার্থপরদের নেই। তাই আমার মতে সেই মানুষদের সাহায্য করা, তাদেরও সমাজের স্থান দেওয়া উচিত।

<u>প্রকৃত মানুষ কে? :</u> মানুষের প্রকৃত গুণ যেমন: দয়া, মায়া, ভালবাসা, সহযোগিতা, সহানুভূতি সম্পন্ন মানুষই প্রকৃত মানুষ। দুর্দশাগ্রস্থ মানুষদের তাদেরকে খুব প্রয়োজন।

<u>কীভাবে মানুষের পাশে দাঁড়াবে?:</u> জলস্ফীতি ঘটলে নদী তার জল তোড়ে যেমন বয়ে যায় ঠিক তেমন করেই আমাদের সব স্বার্থপরতা, লোভ ভুলে গিয়ে মানুষের প্রকৃত গুণগুলি মনে করে, সব সংকীর্ণতা ভুলে গিয়ে, কৃত্তিমতাকে ভুলে গিয়ে অসহায় দুর্দশাগ্রস্থ মানুষের পাশে দাঁড়াতে হবে। এভাবেই মানুষ আবার উন্নতির পথে অগ্রসর হতে পারবে।

<u>উপসংহার:</u> আফ্রিকা একটি প্রাচীন ভাষার নাম 'Bantu'. এই ভাষার প্রবাদ 'Ubantu'. ইংরেজিতে এর অর্থ 'I am because you are'. বাংলায় তর্জমা করলে হয় 'আমি আছি কারণ তোমরা আছ'। মানুষ হলো সামাজিক জীব। মানুষ একা বাঁচতে পারে না। তাই সব মানুষের এটা করা উচিত যে নিজে ভেসে গেলেও অর্থাৎ নিজের জীবন ভেসে গেলেও দুর্দশাগ্রস্থ অসহায় মানুষের পাশে দাঁড়াতে হবে। নইলে তার মানুষ হয়ে ওঠা বৃথা।

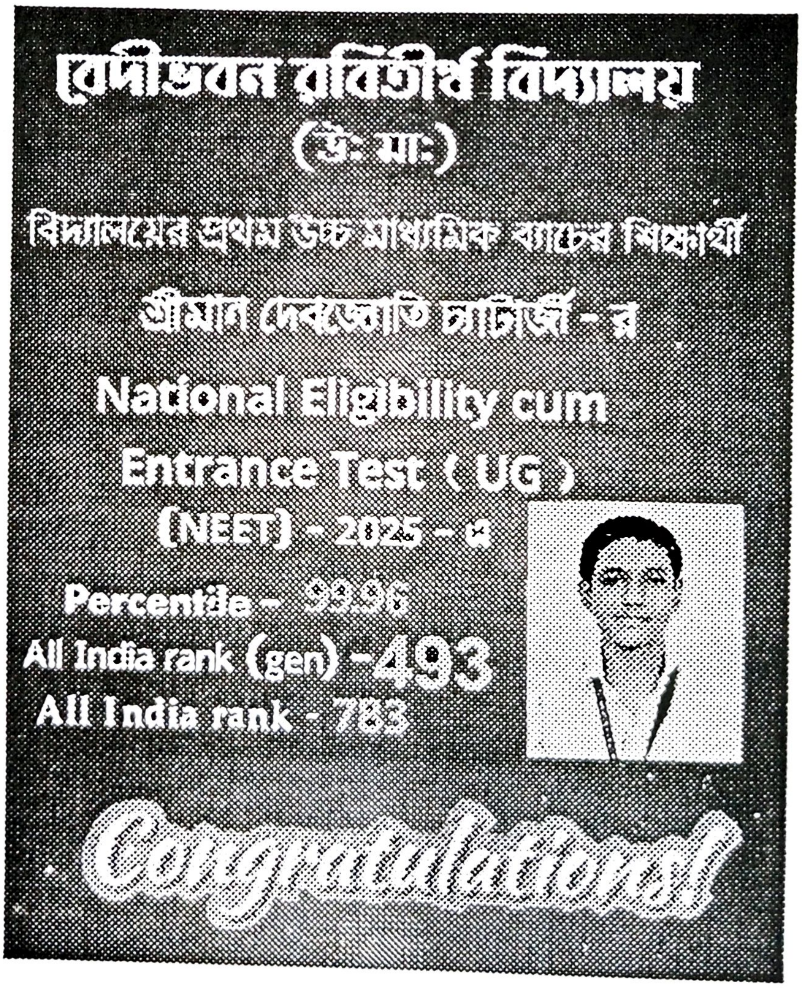

সার্ধদ্বিশতবর্ষে রাজা রামমোহন রায় ও বর্তমান সময়ে তাঁর প্রাসঙ্গিকতা

দেবস্মিতা মিশ্র (নবম শ্রেণি)

"রাজা রামমোহন রায় ভারতে আধুনিক যুগের সূচনা করেছিলেন। তিনি ছিলেন ভারতীয় রেঁনেসার জনক ও ভারতীয় জাতীয়তাবাদের নবী"

-রবি ঠাকুরের কলমনিঃসৃত এই দুটি কথাই যেন আপাদমস্তক একটি মানুষকে বর্ণনা করে।

আলো ছড়ায় পুব দিক থেকেই। অনুরূপে বাংলা নবজাগরণের আলো পুব দিক থেকেই গোটা দেশে ছড়িয়ে পরেছিল।

সত্যিই কি আলো ছড়িয়েছিল?

সেই আলো দেখে কিছু মানুষ কি চোখ বন্ধ করে থাকেননি?

প্রাচ্য ভারতীয় সমাজ তখন অন্ধ কুসংস্কার ধর্মবোধ আর প্রথাসিদ্ধকতার অক্টোপাসে নিদারুণভাবে নিপীড়িত, সেই সময় ক্রমশ ঘন অন্ধকার সরিয়ে পাশ্চাত্য সংস্কৃতির আধুনিক বাতাবরণে বিজ্ঞান ও যুক্তিবাদের চেতনায় কালো রাতকে ভোরের ঠিকানা লিখে দিলেন 'ভারত পথিক' রাজা রামমোহন রায়। ভারতবাসী পেল মুক্তির নতুন দিশা।

পরিচয়: রমাকান্ত রায় ও তারিণী দেবীর সন্তান রাজা রামমোহন রায় ১৭৭৪ সালে ২২ শে মে হুগলী জেলার রাধানগরে জন্মগ্রহণ করেন। কাশীতে সংস্কৃত চর্চা শেষ করে তিনি আরবি, ফারসি, ইংরেজি, গ্রীক, হিব্রু ভাষায় যথেষ্ট জ্ঞানার্জন করেন। পরিবার সুত্রে তাঁর পদবি ছিল বন্দ্যোপাধ্যায়। ইংরেজ সরকার তাকে রাজা উপাধি দেন।

তাঁর কর্মজীবনে আলোকপাত করলে প্রথমে তিনি কলকাতায় মহাজনের কাজ করতেন। পরবর্তীতে তিনি ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির অধীনস্থ কর্মচারী ছিলেন। তিনি প্রতিষ্ঠা করেছিলেন 'ব্রাহ্মসমাজ', 'আত্মীয় সভা' ও 'একেশ্বরবাদ'।

সাহিত্য জগতে কতটা প্রাসঙ্গিক ছিলেন তিনি?: সাহিত্য জগতে তাঁর অবদান অনস্বীকার্য। তাঁর রচনায় ছিল তীক্ষ্ণতা ও যুক্তিনিরীক্ষার স্পষ্ট প্রত্যয়বোধ। তাঁর প্রথম বাংলা গদ্য রচনা 'বেদান্তগ্রন্থ'। এই গ্রন্থে ব্যবহৃত বাক্-ভঙ্গিমা পূর্বে বাংলা গদ্যে দেখা যায়নি। অপরদিকে 'বেদান্তসার' এ প্রকাশভঙ্গি স্বচ্ছ ও জড়তামুক্ত। বাংলা গদ্যকে তিনি একটি ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। বিতর্কমূলক রচনার প্রবর্তক ছিলেন তিনি। যেগুলির ভাষার ঋজুতা ও তীক্ষ্ণতা বিস্ময়কর। তাঁর 'পথ্যপ্রদান' ও 'পাদরি-শিষ্যসম্বাদ' রচনা দুটি কদাচিৎ অর্থগৌরব ছাড়িয়ে শিল্পগৌরব লাভ করেছিল। বাংলা গদ্যকে তিনি দিয়েছিলেন এক নতুন রূপ। যেখানে ছিল কঠোরতার অন্তরালে গভীর বিশ্লেষণ বোধ। তিনি লেখনির বাংলা সমাজ ব্যবস্থার মূলে কুঠারাঘাত করেছিলেন। বাংলা ভাষার বিশুদ্ধি রক্ষার্থে তাঁর অনন্য কীর্তি 'গৌড়ীয় ব্যাকরণ'।

সমাজ সংস্কারক হিসেবে কতটা প্রাসঙ্গিক তিনি একবিংশ শতাব্দীর তৃতীয় দশকে?: বহিরঙ্গের জৌলুসে বর্তমানকে অনেকটা আলাদা মনে হলেও সত্যিই কি আলাদা?। পরিবর্তনটা কার সময় থেকে?

রাজা রামমোহন রায় তাঁর জন্মকালেরই আধুনিক সমাজের কিছুটা গাঁথুনি করে রেখে গিয়েছিলেন। আর তাঁর ওপরই রচিত হয়েছিল বর্তমানের রূপরেখা।

তাঁর কীর্তিগুলি বর্তমান যুগেও প্রাসঙ্গিক।

* তিনি নারীর অধিকার, সতীদাহ প্রথা বিলোপে ভূমিকা পালন করেছিলেন। তাঁর কীর্তিগুলি বর্তমান সময়ে নারীর অধিকার, স্বাধীনতায় নতুন প্রেরণা জোগায়।

* তিনি লক্ষ্য করেছিলেন হিন্দুদের বহুবিবাহ প্রথা ও সতীদাহ প্রথার মর্মান্তিক নারী বলি। বেদান্ত উপনিষদ ঘেঁটে তিনি প্রমাণ করেন সতীদাহ প্রথা অশাস্ত্রীয় ও নীতিবহির্ভুত। নিষ্ঠুর প্রথার প্রতিবাদে রচনা করেন 'সহমরণ বিষয়ক প্রবর্তক ও নিবর্তকের সংবাদ'। লর্ড বেন্টিঙ্কের সহায়তায় ১৮২৯ সালে সতীদাহ প্রথা রোধ করেন। নারী জাতিকে দিলেন জীবনের নতুন স্বাদ। ঝড়ঝাপটা শেষে আজ নারীরা আকাশের যতটুকু ছুঁতে পেরেছে, তা তাঁরই প্রচেষ্টায়। কিন্তু যুক্তিদাতার জন্মের সার্ধদ্বিশতবর্ষ পরেও আজ একবিংশ শতকের তৃতীয় দশকে দাঁড়িয়ে সত্যিই কি নারীরা মুক্ত?

সমাজের কিছু অর্থলোলুপ রক্তচোষক নেকড়ের জন্য আজও নারী জাতি অবহেলিত, অসম্মানিত।

আজ প্রতিটি শুভবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষের মধ্যে প্রয়োজন রামমোহনকে। যাঁর চরিত্রে থাকবে বলিষ্ঠতা, চেতনায় থাকবে উজ্জ্বল দীপ্তি।

যন্ত্রযুগের ক্ষীপ্রতায় আজ রামমোহনের আদর্শ খুবই প্রয়োজন। তবেই তিনি হয়ে উঠবেন প্রাসঙ্গিক।

উপসংহার: ধর্মীয় সহিষ্ণুতা ও মানবতার ক্ষুধার্ত কণ্ঠ ধর্মীয় অসহিষ্ণুতার যুগে প্রাসঙ্গিক হয়ে উঠছে। সামাজিক ও ধর্মীয় বিষয়ে মুক্ত চিন্তা ও যুক্তিবাদ বর্তমান জীবনে স্বাধীন মত প্রকাশে ও মুক্ত চিন্তায় অনুপ্রেরণা। বলা যায়, প্রগতিশীল চিন্তাধারা ও সমাজ সংস্কারে তাঁর অবদান আজকের সমাজকে নতুনভাবে উজ্জীবিত করছে। জন্মের এত বছর পরেও আজ সমাজের প্রতিটি স্তরে রাজা রামমোহন রায় সমানভাবে প্রাসঙ্গিক। তাঁর তাৎপর্য অমলিন হয়ে থাকবে বাঙালি তথা ভারতবাসীর ইতিহাসে।

কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা

সমৃদ্ধি মুখার্জি (দশম শ্রেণি)

ভূমিকাঃ- দেখুন মশাই, সে আপনি রসগোল্লা নিয়ে পদ্য বানাতে চান, কিংবা জানতে চান জীবনের মানে, কিংবা হয়তো সকাল-সকাল ঠাকুরকে পুজো দিতে গিয়ে মনে পড়লো, " আরে হনুমান চল্লিশা তো পড়ছি কিন্তু মানে বুঝতে পারছি না" আচ্ছা এর কথা না হয় ছেড়েই দিলাম, ইচ্ছে হল বরিশালের কায়দায় ধোকার ডালনা বানাবো, কিন্তু রেসিপি? তা তো জানা নেই। কী হবে? সব প্রশ্নের সবকিছু সমাধান এখন হাতের মুঠোয়, কী করতে হবে জানেন? হাতের মধ্যে থাকা ফোনটা খুলে ফেলুন, খুলুন Chatgpt, কিংবা Gemini কিংবা Meta AI- কথা বলে দেখুন, নিমিষেই চোখের পলকে পেয়ে যাবেন সমাধান। আরে মশাই! ঘাবড়াবার কিছু নেই সোজা সহজ কথায়, যুগ পাল্টাচ্ছে এগোচ্ছে সময়, চলে এসেছে মানব বুদ্ধির সাথে টক্কর দিতে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা। যদিও এটা মানব বুদ্ধির ফল। তার সাথে কথা বলুন বা Chat করুন।

কি এই AI বা কী করে হলো এত কিছু?:

২০২৪ সালে বিশিষ্ট জন হোম পৃহপফিল্ড ও জিওফ্রে হিনটন নোবেল পেলেন AI - এর জন্য নিউরাল নেট তৈরিতে। যন্ত্র সভ্যতা তো সেই কত যুগ যুগ আগের থেকে শুরু হয়েছে। প্রাচীনকালে, মুদ্রার ভাস্কর্যে যে সমস্ত রাজাদের ছবি থাকতো, সেই রকমই এক মুদ্রায় পাওয়া গেছে এক বিশিষ্ট রাজার টেলিফোন কানে ছবি। ভাবতে পারছেন! সেই সময়ের যন্ত্রের জোর!

এখন প্রশ্ন হচ্ছে এই যে নিউরাল নেটের কথা বললাম, কী এই নিউরাল নেট? এই প্রশ্নের উত্তর পেতে গেলে একটু জীবন বিজ্ঞান বইটায় চোখ বোলাতে হবে। মনে করুন, চোখের সামনে আনুন, ছেলেবেলায় পড়া নিউরোন- এর ছবি, স্নায়ুতন্ত্র, মস্তিষ্ক, এদের কানেকশন। হ্যাঁ, স্রেফ Ctrl+c এবং Ctrl+v অর্থাৎ একই ধারণায় তৈরি হয়েছে, মানে কপি পেস্ট হয়েছে যন্ত্রের শরীরে, যার জন্য তারা নিজেরাই আপত্তি করছে নিজের বুদ্ধিমত্তার।

কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তায় ভারতঃ হ্যাঁ, ভারত কিন্তু বেশ অগ্রগতির সাথে AI-এর হাত ধরে এগিয়ে চলেছে। AI-এর ভিত্তিতে Top ১০ এর ৮ নং স্থান কিন্তু ভারতের। এদিক থেকে ভারত কিন্তু পিছনে ফেলে দিয়েছে রাশিয়া ও ফ্রান্সকেও।

SAAS নামক একটি AI সংস্থার এক বিশেষ সমীক্ষায় দেখা গেছে AI প্ল্যাটফর্ম উৎপত্তিতে বা AI যন্ত্র উৎপত্তিতে বিগত দশ বছরের মধ্যে ভারতীয় পেটেন্টের সংখ্যা ঘেড়েছে ১০ গুণ! আবার ২০18 সালে নীতি ইয়োগ #AIFORALL নামক একটি বিশেষ কার্য শুরু করেন, যাতে সাড়া দেয় প্রায় ১০,০০০ জন ভারতীয় কিশোর কিশোরী। তাদের অভিনব চিন্তাভাবনার খোরাক-এ অবাক হয়ে যান এবং স্বয়ং Meta-র প্রতিষ্ঠাতা Mark Zuckerberg. অসম্ভব প্রচেষ্টায় এগিয়ে যাচ্ছে

ভারত। বিশেষজ্ঞরা বলছেন ২০৩০ এর দিকে ভারত পৌঁছবে নীল অর্থনীতির আঙিনায়। অসম্ভবকে সম্ভব করবে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা।

AI মিলায় বস্তু তর্কে বহুদূর: মনে আছে ২০১৯ সালে কলকাতায় নেতাজি ইন্ডোর স্টেডিয়ামে হাজির হয়েছিলেন এক সুন্দরী তরুণী, শাড়ি পরিহিতা। স্পষ্ট বাংলা বলছিলেন তিনি, এদিকে তিনি বিদেশীনি। জন্ম USA, বসবাস USA, সদ্য কলকাতায় এসেই স্পষ্ট বাংলা! ভাবতে পারেন? হ্যাঁ, Miss Sofia - এই অসম্ভবকে সম্ভব করেছিলেন। যদিও তিনি মানুষ নন, একজন কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা পরিচালিত রোবট।

আবার যদি একটু ওড়িয়া news channel গুলি লক্ষ্য করেন, চোখে পড়তে পারে একজন ওড়িয়া নিউজ রিপোর্টার লিসা দেবীকে। হ্যাঁ লিসা দেবী খবর পড়ছেন। পড়ছেন আজকের weather report, ঠিকই ধরেছেন, তিনিও একজন AI রোবট। বাংলাদেশের নিউজ চ্যানেলেও খবর পড়ছেন অপরাজিতা। তিনিও AI রোবট।

AI নিয়ে আশঙ্কা?:

"গেলরে গেল! সব চাকরি- গেল বেকারত্ব বেড়ে গেল গো"!

না, না, এত ভয় পাওয়ার কিছু নেই। AI-ই চাকরি দেবে। White collar বা অত্যন্ত মেধাবীদের সঠিকভাবে যাচাই করে, ৩৬ লক্ষেরও বেশি লোকজন চাকরি পাবেন বছরে। মনে পড়ছে, সেই যে যখন আমাদের কম্পিউটার বা ইন্টারনেট এলো, একই আশঙ্কা সবাই করেছিলেন। হল কি তেমন ভয়ংকর কিছু? আশা করা যায় তেমনটা হবে না।

আবার ধরুন আপনি লিখলেন বা বললেন "দিল্লির কিছু বিখ্যাত স্থান ও সেইখানে কম খরচায় যাতায়াত থাকা-খাওয়া ইত্যাদির উপায় বলে দাও" AI কিন্তু ভুল কিছু বলবে না বরং আপনাকে সঠিক রাস্তাই দেখাবে। আমার মতে বেকারত্ব কমবে বই বাড়বে না। ভবিষ্যতে সত্যিই এর প্রয়োজন লক্ষণীয় হবেই।

মানুষ বড় একলা, AI কি পাশে দাঁড়াবে?: অবশ্যই, বর্তমানে এবং অদূর ভবিষ্যতে কোনো AI পরিচালিত রোবট আপনার সাথে ছুটির দিনে দাবা খেলবে। কিন্তু কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা কিন্তু তার মালিককে জোর প্যাঁচে ফেলতে পারে! গল্প করার সঙ্গী হিসেবে পেতে পারেন এঁকে। আবার অত্যন্ত নৈপুণ্যের সাথে সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম ত্রুটি নির্মূল করে দেবে।

উপসংহার: বর্তমান পরিস্থিতির রেশ নিয়ে বলছি, AI কি পারবে CBI তদন্ত গুলিতে সাহায্য করতে। accuracy ৯৯.৯৯% হলেও ০.০১% ত্রুটি সবারই থাকে। ত্রুটি নেই এমন জিনিস খুঁজে পাওয়া দুষ্কর। AI এখন গানে, সিনেমায়, মৃত মানুষের কণ্ঠে নতুন গান ফিরে আসছে। আবার উত্তম কুমার আছেন নতুন ছবির নায়ক হিসাবে! এখন এই কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তাকে আপনি সহকারী বন্ধু হিসেবে না কোনো অসৎ উদ্দেশ্যে ব্যবহার করবেন সেটা আপনার ব্যাপার। একটি হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ বর্তমানে সমগ্র শল্য চিকিৎসার ভার দিয়েছে AI ROBOT দের ওপর। তবে যাই হোক না কেন প্রাচীনকালের সেই লক্ষণ রেখার কথা মাথায় রাখতে হবে।

জাগো নারী, জাগো বহ্নিশিখা

কৃষ্টি চক্রবর্তী (একাদশ শ্রেণি)

'এ বিশ্বে যা কিছু মহান সৃষ্টি চির কল্যাণকর
অর্ধেক তার করিয়াছে নারী অর্ধেক তার নর'।
- কাজী নজরুল ইসলাম।

নারী হলো সৃষ্টির প্রতীক। এ বিশ্ব সংসারের সৃষ্টি, মানব সভ্যতার সৃষ্টি নারী ছাড়া কল্পনায় আনা যায় না। আদিম যুগ থেকে পুরুষের সাথে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে নারীজাতি আজ মানবসভ্যতাকে এগিয়ে নিয়ে এসেছে। কৃষিকাজ, পশুশিকার, পশুপালন সমস্ত কাজেই নারীর অবদান ছিল পুরুষের সমান। রাহুল সংকৃত্যায়নের 'ভলগা থেকে গঙ্গা' - পড়লে জানা যায় নারীকেন্দ্রিক সভ্যতার কথা, পরবর্তীকালে পুরুষের অর্জিত সম্পদের উত্তরাধিকার নির্বাচনে নারীকেন্দ্রিক সমাজ, থেকে পুরুষতান্ত্রিক সমাজে পরিণত হয়। তখন নারীরা আর অন্যান্য সম্পদ (যেমন- ভূমি, গাভী ইত্যাদি)-এর মতন সম্পদ হিসেবে পরিগনিত হয়। তার স্থান হয় অন্দরমহল অথবা বাজার।

এই অন্ধকারময় সময়কাল থেকে বেরিয়ে আসতে আসতে নারীর হাজার হাজার বছর লেগে যায়। ভারতবর্ষে তাদের অন্ধকার থেকে আলোর পথে আনার কথা প্রথম ভাবেন রামমোহন রায়, পরবর্তীকালে বিদ্যাসাগর মশাই। এখন আমরা গর্বের সাথে বলতে পারি আমাদের বর্তমান রাষ্ট্রপতি একজন মহিলা আর আমরা ক্রমেই নারী ক্ষমতায়নের পথে এগিয়ে চলেছি।

<u>নারী ক্ষমতায়ন:</u> নারী ক্ষমতায়ন হলো এমন একটি বহুমুখী ধারণা যা নারীকে তার রাষ্ট্র দ্বারা প্রদত্ত গণতান্ত্রিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক সুযোগগুলি ভোগ করার ক্ষমতা দেয় এবং শিক্ষার মাধ্যমে তাকে একজন প্রকৃত মানুষ হিসেবে বাঁচার স্বাধীনতা দেয়।

<u>ভারতবর্ষে নারী ক্ষমতায়ন ও শিক্ষা:</u> শিক্ষা হলো নারী ক্ষমতায়নের প্রধান স্তম্ভ। শিক্ষাই পারে নারীজাতিকে ক্ষমতাশীল করে তুলতে। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর প্রথম বুঝেছিলেন যে- নারীজাতির পিছিয়ে থাকার কারণ ছিল অশিক্ষা এবং কুসংস্কার। তাই তিনি নারীশিক্ষা প্রসারে ব্রতী হয়েছিলেন। শিক্ষা শুধুমাত্র মানুষকে 'শিক্ষিত'-ই করে তোলে না, গড়ে তোলে তার আত্মবিশ্বাস, তাকে সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা প্রদান করে। নারীশিক্ষার প্রধান লক্ষ্য হলো নারীকে একজন শিক্ষিত, স্বাধীন, যুক্তিনির্ভর মানুষে পরিণত করা।

<u>অর্থনৈতিক স্বাধীনতা:</u> নারী ক্ষমতায়নের অন্যতম স্তম্ভ অর্থনৈতিক স্বাধীনতা। শিক্ষাগত যোগ্যতার পাশাপাশি প্রকৌশলগত দক্ষতা অর্জন করে একজন নারী ভালো বেতনের চাকরি করতে পারবে বা নিজ উদ্যোগে ব্যবসা করতে পারবে, যা তাকে করে তুলবে অর্থনৈতিকভাবে স্বাধীন। তাকে তার দৈনন্দিন জীবনধারণের জন্য, প্রয়োজনীয় 'Basic Needs' এর জন্য নির্ভরশীল হতে হবে না অন্য কারো ওপর। তার সিদ্ধান্তকে পরিবারে এবং বৃহত্তর সমাজে গুরুত্ব দেওয়া হবে।

<u>লিঙ্গ বৈষম্য:</u> নারী ক্ষমতায়নের পথে অন্তরায়- লিঙ্গ বৈষম্য। শৈশব থেকেই এর বীজ অঙ্কুরিত হতে শুরু করে একজন নারীর জীবনে। পরিবারের লোকজন, আত্মীয় -পরিজনেরা তাকে সুযোগ-

সুবিধা ভোগ ও পিতৃসম্পত্তি থেকে বঞ্চিত করার চেষ্টায় থাকে। এমনকি কিছু কিছু ক্ষেত্রে তাকে পুষ্টিকর আহার থেকে বঞ্চিত করা হয়।

যেখানে ছেলেদের ছোটোবেলা থেকে শারীরিক চর্চা, পড়াশুনো, চাকরি পাওয়া, বাইরে যাওয়া ও সমাজে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করাতে উৎসাহ প্রদান করা হয়, সেখানে মেয়েদের শৈশবকাল থেকেই অন্দরমহলে থেকে গৃহস্থালির কাজ করা ও একটু বড়ো হলেই বিয়ে দেওয়ায় উৎসাহ প্রদান করা হয়। গ্রামীণ অঞ্চলে এই মনোভাব বেশি দেখা যায়। প্রকৃত শিক্ষা ও জনসচেতনতাই পারে এই ধারণাগুলি থেকে মানুষকে মুক্ত করতে। পাশাপাশি নারীদের গণতান্ত্রিক, প্রশাসনিক ক্রিয়াকলাপে আরো বেশি করে অংশগ্রহণ প্রয়োজন।

"এ সভ্যতা তোমাকে ত্যাগে করেছে মহান,
সাহিত্যে, চালচ্চিত্রের চিত্রনাট্যে,
তুলে ধরেছে অবলা করে,
নারী তুমি অধিকারে হও সমান।"

নারী নির্যাতন ও নারী সুরক্ষা:

'কতবার বিক্রি হয়েছো
পতিতা হয়ে বসেছো বাজারে লুণ্ঠিত দস্যু হাতে,
কতবার হয়েছো হাত বদল,
সাম্রাজ্যের উত্থান-পতনে'।

নিরাপত্তা সবার মৌলিক অধিকার। অথচ, ২০০৭ সালের একটি Survey-তে দেখা গেছে ৫৩% শিশুকন্যারা এক-বা একাধিকবার যৌন নির্যাতনের স্বীকার হয়। যেখানে যৌন অপরাধীদের ৫০% ভিকটিমদের পরিচিত বা নিজস্ব পরিবারের লোক। ভাবুন একজন শিশুকন্যা তার পরিবারেই সুরক্ষিত না। সে বৃহত্তর সমাজ বা কর্মক্ষেত্রে কতটা সুরক্ষিত হতে পারে? এর উত্তরই চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিয়েছে দিল্লীর নির্ভয়া ও 9th August, 2024 -এর আর.জি.কর হাসপাতালের কর্মরত তিলোত্তমার ধর্ষণ ও হত্যাকান্ড। ভাবলেই, গায়ে কাঁটা দিয়ে ওঠে, তাইনা? অথচ, এমন কতই ঘটনা ঘটে যাচ্ছে, অহরহ। তাদের অর্ধেকের বেশিরভাগ কেশ রেজিস্টারড হয় না।

আছে পারিবারিক হিংসা। এখনও কন্যাসন্তান জন্মালে লাঞ্ছনা, গঞ্জনা শুনতে হয় মা নামক নারীকে। কারণ অনেকেই এখনো- 'পুত্র সন্তান বংশের প্রদীপ'- এই ধারণা মনে পোষণ করেন। যদি তাইই হয় তবে- 'কন্যাসন্তান দুই বংশের প্রদীপ'। যদি সাধারণ মানুষ একথা বুঝতো তবে হয়তো এখনো ভারতবর্ষে ভ্রূণ হত্যা হতো না। কতো নিঠুর নৃশংস ভাবে আজও হত্যা করা হয় ভবিষ্যতের মাকে, তার মায়ের পেটেই।

কন্যা যদি পিতৃঘর থেকে শিক্ষাগ্রহণ করে ডিগ্রী অর্জন করে চাকরি পায়ও, তখনও অনেকসময় বিয়ের পর চাকরি করা যাবে না বলে দাবি রাখা হয় তার কাছে কারণ- সে যদি বাড়ির বাইরে যায় তবে সংসার কে সামলাবে? আর তার অভাবে হয়তো সে সংসার উচ্ছনে যাবে।
-এই ধারণা পোষণ করেন অনেক উচ্চ শিক্ষীত পরিবার। যা থেকে বেরিয়ে আসার সময় আছে এখনও আমাদের কাছে। আধুনিকতার গতির সাথে তাল মেলাতে চাইলে এ-ধরনের বিকৃত মানসিকাতাকে বর্জন করতে হবে।

জাতির প্রতি নারীর অবদান: সেই কোন আদিকাল থেকে স্বাধীনতার সময়ে ঝাঁসির রানী লক্ষ্মীবাঈ, প্রীতিলতা ওয়াদ্দেদার, ইন্দিরা গান্ধী প্রমুখ নারীর অসামান্য অবদান আজও আমাদের কাছে স্মরণীয়। বর্তমানে আমাদের ভারতের রাষ্ট্রপতির আসনে বিরাজমান- শ্রীমতী দ্রৌপদী মুর্মু।

Paris Olympics-2024- এ আমরা দেখলাম ভিনেশ ফাগাটকে, একজন মহিলা কুস্তিগীর, কী অসাধারণ ভাবে ফাইনালে তার জায়গা করে নিয়েছিলেন।

দেখলাম ২২ বছর বয়সী মনু ভাবারকে, তিনি একাই ২টি পদক জিতে ইতিহাস রচনা করলেন।

বিলকুইস মীর, জম্মু ও কাশ্মীর থেকে উঠে আসা এই অসামান্যা ভারতের ইতিহাসে - মহিলা জুরি সদস্যা হিসেবে নাম খিালেন।

2024 -এর বিজনেস ওয়ার্ল্ড-এর উজ্জ্বল নাম Gazal Alagh - তিনি Mama Earth-company-এর বিজনেস-এ e-commerce এ অসামান্য অবদানের জন্য পুরস্কৃত হন।

থার্মাক্স কোম্পানির মেহের পড়ুমজিও তার অসামান্য বিজনেস স্ট্র্যাটাজির জন্য খ্যাত।

চন্দ্রযান-৩ এর উৎক্ষেপনের পিছনে ছিলেন- Dr. রিতু করিদল শ্রীবাস্তব, নন্দিনী হরিনাথ, অনুরাধা TK, বিনাল রোহিত, অনুরাধা দত্তের মতো অসংখ্য মহিলা বিজ্ঞানীরা। চন্দ্রযান-৩ -এর নির্মাণে ২৫% কর্মী ছিলেন মহিলা। তারা বাকি পুরুষ কর্মীদের সাথে সমান অবদানে সারা বিশ্বের কাছে ভারতবর্ষের ও ISRO-এর মুখোজ্জ্বল করেছেন।

‘নারীকে আপন ভাগ্য জয় করিবার
কেন নাহি দিবে অধিকার
হে বিধাতা
সার্থকের পথ।
কেন না ছুটাব তেজে সন্ধানের রথ
দুর্বর্ষ অশ্বেরে বাঁধি দৃঢ় বল্গাপাশে’।
-রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

প্রতিকূলতা থাকবেই। তার বিরুদ্ধে আমাদের লড়াই চলছে, চলবে। সতীদাহ প্রথা এখন আর দেখা যায় না। কিন্তু গ্রামাঞ্চলে এখনও বাল্যবিবাহ দেখা যায়। আর কতদিন? কতদিন আর এই ভ্রান্ত ধারণায় ডুবে থাকবে মানুষ? শহরাঞ্চলের মেয়েরা বাল্যবিবাহের শিকার না হলেও তারা অল্প বয়সে মোহের বশে বিয়ে করে নেয়, পরবর্তীকালে মোহভঙ্গ হলে তারা সংসারের বোঝা ও তার শিশুসন্তান নিয়ে অনিশ্চিত জীবনে এসে পড়ে। আমরা যারা, এ বিষয়ে সচেতন, তারা জনসচেতনতার মাধ্যমে এগুলিকে আটকাতে পারি।

নারীদের নাচ, গান, আবৃত্তি, পড়াশোনার পাশাপাশি শিখতে হবে জুডো, ক্যারাটে - যাতে সে নিজেকে সঠিক সময়ে রক্ষা করতে পারে বিপদে। নিজেই নিজের ঢাল হয়ে উঠুক নারীরা। তাকে মনে রাখতে হবে তার মধ্যে লক্ষ্মী, সরস্বতীর পাশাপাশি বিরাজ করছে দুর্গা, কালী-ও। তাই মাতৃসত্তার পাশাপাশি তার মধ্যে জেগে উঠুক কালী-সত্তাও। জেগে উঠুক নারীসমাজ। শিক্ষিত, স্বাধীন হয়ে মাথা তুলে বাঁচুক নারীরা।

"মেঘে আনো বালা বজ্রের জ্বালা,
চির বিজয়িনী জাগো জয়ন্তিকা।"
– নজরুল ইসলাম

দুই নভোচারীর মহাকাশ থেকে বিলম্বিত ফেরার কাহিনি

তৃষ্ণা মজুমদার (দশম শ্রেণি)

আন্তর্জাতিক মহাকাশ স্টেশন (International Space Station-ISS) হলো একটি বৃহৎ গবেষণাগার যা পৃথিবীর নিকটস্থ কক্ষপথে অবস্থান করে এবং গবেষণা ও মানব বসবাসের জন্য ব্যবহৃত হয়। এটি বিশ্বের বিভিন্ন মহাকাশ সংস্থার যৌথ প্রকল্প, যার মধ্যে রয়েছে নাসা (মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মহাকাশ সংস্থা), রসকসমস (রাশিয়ার মহাকাশ সংস্থা), ইসা (ইউরোপের মহাকাশ সংস্থা), জাক্সা (জাপানের মহাকাশ সংস্থা) এবং সি.এস.এ. (কানাডার মহাকাশ সংস্থা)। এই মহাকাশ স্টেশনের প্রথম মডিউল 'জারিয়া' উৎক্ষেপন করা হয় ২০ নভেম্বর, ১৯৯৮ সালে এবং প্রথম মহাকাশচারী দল সেখানে পৌঁছায় ২ নভেম্বর, ২০০০ সালে। এর পর থেকে এটি নিরবচ্ছিন্নভাবে পরিচালিত হয়ে আসছে এবং নতুন মডিউল সংযোজনের মাধ্যমে ক্রমাগত সম্প্রসারিত হয়েছে।

আই.এস.এস (ISS) পৃথিবীর প্রায় ৪২০ কিলোমিটার উচ্চতায় কক্ষপথে অবস্থান করে এবং প্রতি ৯০ মিনিটে একবার পৃথিবীকে প্রদক্ষিন করে। এটি প্রায় ২৮০০০ কিলোমিটার প্রতি ঘন্টা গতিতে চলে। স্টেশনটি ১০৯ মিটার দীর্ঘ, যা একটি ফুটবল মাঠের সমান। এটি বিজ্ঞান গবেষণাগার, মহাকাশচারীদের থাকার জায়গা, বিশাল সৌর প্যানেল এবং উন্নত রোবোটিক বাহু দ্বারা সজ্জিত। এখন পর্যন্ত ২০টিরও বেশি দেশের ২৭০-এর বেশি মহাকাশচারী আই.এস.এস-এ এমন করেছেন। এটি বিভিন্ন দেশের বৈজ্ঞানিক ও প্রযুক্তিগত উন্নয়নের জন্য এক গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্র।

২০২৪ সালের ৫ই জুন, আমেরিকায় একটি স্টারলাইনার মহাকাশযান উৎক্ষেপন করা হয়। এটি নাসার দুইজন অভিজ্ঞ মহাকাশচারী, কমান্ডার বুচ উইলমোর এবং পাইলট সুনিতা উইলিয়ামসকে আন্তর্জাতিক মহাকাশ স্টেশনে একটি ছোট সফরের জন্য নিয়ে যাচ্ছিলেন। তারা যেই মহাকাশযানে যাত্রা করছিলেন, সেটি ছিল স্টারলাইনার, যা একটু আলাদা। এটি তৈরি করেছে একটি বেসরকারি প্রতিষ্ঠান, বোয়িং - যে কোম্পানি বিমান তৈরি করে, এই কারনেই এই মিশনটির নাম দেওয়া হয়েছিল 'বোয়িং ক্রু ফ্লাইট টেস্ট' বা 'বোয়িং স্টারলাইনার'।

স্টারলাইনারের প্রথম উৎক্ষেপণের তারিখ ৬ই মে ২০২৪ নির্ধারিত হয়েছিল, তবে উৎক্ষেপণের দুই ঘন্টা আগে একটি ত্রুটিপূর্ণ চাপ ভালভের কারণে এটি বন্ধ করে দেওয়া হয়। এরপর, ১ জুন আরেকটি প্রচেষ্টা করা হয়, কিন্তু উৎক্ষেপনের মাত্র চার মিনিট আগে এটি বাতিল করা হয় কারণ কম্পিউটার সিস্টেমে একটি সমস্যা শনাক্ত করে এবং কম্পিউটার স্বয়ংক্রিয় পদ্ধতিতে উৎক্ষেপন বাতিল করে। ৫ জুন, বোয়িং ও নাসার প্রকৌশলীরা হিলিয়াম লিক সামলাচ্ছিলেন, যা প্রধান প্রপালশন গ্যাস হিসেবে ব্যবহৃত হয়। এর পরেও উৎক্ষেপন সম্পন্ন হয়, কিন্তু

আই.এস.এস-এ পৌঁছানোর পর আরও লিক পাওয়া যায় এবং ২৮টি থ্রাস্টারের মধ্যে ৫টি কাজ করছিল না। কমান্ডার ব্যারি উইলমোরকে মহাকাশযানটির ম্যানুয়ালি নিয়ন্ত্রণ করতে হয়। এর ফলে, ৫টির মধ্যে ৪টি পুনরায় কাজ করতে শুরু করে, যা মহাকাশযানটিকে ডকিং করতে সহায়তা করে। পরে পরীক্ষায় স্টারলাইনার মহাকাশযানটিতে বেশি গরম হয়ে যাওয়ার (Over heating) সমস্যার বিষয়টি ধরা পড়ে। এরপর স্টারলাইনার মহাকাশযানটিকে আরো খুঁটিয়ে পরীক্ষা করা হয় এবং বোঝা যায় যে মহাকাশচারীদের নিয়ে আই.এস.এস. থেকে পৃথিবীতে ফেরত আনা খুব ঝুঁকিপূর্ণ হয়ে যাবে।

অবশেষে বোয়িংয়ের স্টারলাইনার মহাকাশযান প্রায় তিন দিন পরে, ৭ই সেপ্টেম্বর, ২০২৪, শনিবার নিউ মেক্সিকোতে অবতন করে খালি হাতে, মহাকাশে যাদের এই মহাকাশযানটি নিয়ে গিয়েছিল বুচ উইলমোর এবং সুনিতা উইলিয়ামস-এঁদের নিরাপত্তার কথা মাথায় রেখে তারা আই.এস.এস.এই থেকে যান।

ইলন মাস্কের সংস্থার স্পেস-এক্স (Space X) এর মহাকাশযান ব্যবহার করে ফেব্রুয়ারিতে সুনিতা উইলিয়ামস এবং বুচ উইলমোরকে ফিরিয়ে আনার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। এরপর আবার সিদ্ধান্ত বদল করে মার্চ মাসের শেষে তাদের ফেরার কথা ঠিক করা হয়েছিল, যা তাদের মহাকাশে থাকাকে আরো দীর্ঘায়িত করে। অবশেষে ১৯ মার্চ, ২০২৫ ভারতীয় সময় ভোর ৩টে ২৭ মিনিটে ফ্লোরিডার টালাহাসির উপকূলের কাছে মেক্সিকো উপসাগরে নিরাপদে পৃথিবীতে অবতন করেন সুনিতা উইলিয়ামস এবং বুচ উইলমোর।

শরীরে তরল পুনর্বণ্টন ঘটনাটি নভোচারীদের মধ্যে সবচেয়ে লক্ষণীয় পরিবর্তনের একটি। পৃথিবীতে মাধ্যাকর্ষণের কারণে শরীরের তরলগুলি নিচে সরে যায়, কিন্তু মহাকাশে এটি মাথা এবং শরীরের উপরের দিকে সরে যায়। এর ফলে নভোচারীদের মুখ-মন্ডল ফুলে যায় এবং মাথার আকার বড় দেখায়, যদিও 'তুবড়ে যাওয়া গাল' উদ্বেগজনক মনে হতে পারে, সুনিতা উইলিয়ামস বলেছেন যে এটি মাইক্রোগ্রাভিটির সাথে মানিয়ে নেওয়া একটি সাধারণ প্রক্রিয়া। বর্তমানে, সুনিতা উইলিয়ামস এবং বুচ উইলিমোর পৃথিবীতে ফিরে এসেছেন এবং তাদের পুনর্বাসনের জন্য ৪৫ দিনের একটি ব্যবস্থা শুরু হয়েছে।

আমাদের ভারতও মহাকাশে মহাকাশচারী পাঠানোর প্রযুক্তিতে পিছিয়ে নেই। গগনযান প্রকল্পটি ইসরোর (ISRO) মানব মহাকাশযাত্রার ক্ষমতা প্রদর্শনের উদ্দেশ্যে পরিকল্পিত। এই অভিযানে ৩ সদস্যের একটি মহাকাশযান ৪০০ কিলোমিটার কক্ষপথে ৩ দিনের মিশনের জন্য উৎক্ষেপণ করা হবে এবং তাদেরকে নিরাপদে পৃথিবীতে ফিরিয়ে আনার পরিকল্পনা করা হয়েছে।

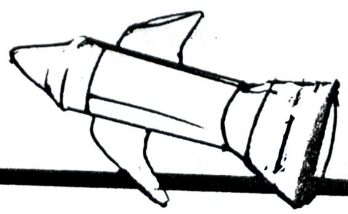

সৃজিতা পাল (ষষ্ঠ শ্রেণি)
দেবাদৃতা সরকার (ষষ্ঠ শ্রেণি)

"এটি হল সেই গল্পগুলির মধ্যে অন্যতম যা কোকির ঠাকুমা এক বর্ষণমুখর সন্ধেবেলায় বাচ্চাদের বলছিলেন, যখন বাইরে গিয়ে খেলা করা অসম্ভব হয়ে ওঠে, ঠাকুমা গাছ ভালোবাসতেন এবং এটি হল তার প্রিয় গাছের গল্পগুলির মধ্যে অন্যতম"

রাজা এবং বৃক্ষ-দেবী

- রাসকিন বন্ড

একদা হিমালয়ের পাদদেশীয় তরাই অঞ্চলে এক রাজা বসবাস করতেন, যার ইচ্ছে ছিল এমন একটি প্রাসাদ বানানোর যা তিনি পৃথিবীর অন্য কোথাও দেখেননি। তিনি অতীব ব্যয় এবং বাধা বিপত্তি ছাড়া এটিকে দীর্ঘতর শক্তিশালী বানাতে পারতেন না। তাই তিনি সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন কিছু অভিনবত্ব তৈরি করার। পুরো প্রাসাদটি একটি মাত্র স্তম্ভের অবলম্বন করে তৈরি হবে এবং সেই স্তম্ভটি তৈরি হবে সেই সাম্রাজ্যের দীর্ঘতম বৃক্ষ থেকে।

হিমালয়ে প্রচুর সুউচ্চ বৃক্ষ বর্তমান- স্প্রুস এবং পাইন, ওক এবং দেবদারু এবং সবচেয়ে উচ্চতম এবং দৃঢ়নিষ্ঠ হল দেবদারু, যার নাম দেব-দারু, মানে ঈশ্বরের গাছ।

রাজা তার প্রধানমন্ত্রীকে ডেকে পাঠালেন এবং বললেন, "আমার দূর-দুরান্তের বনে লোক পাঠাও এবং তাদের দেরি না করে শহরের সবচেয়ে বড় দেবদারু গাছটি কেটে নিয়ে আসতে বলে দাও"।

"কিন্তু দেবদারু যে পবিত্র বৃক্ষ,"- তার কন্যা প্রতিবাদ করল। "এটি শুধুমাত্র মন্দির নির্মাণ করতেই ব্যবহার করা হয়"।

"তাহলে সেটা তো আরো প্রধান কারণ হল, গাছটি আমার পাওয়ার জন্য"-রাজা বললেন। "আমার প্রাসাদ কোনো মন্দিরের মতোই আকর্ষণীয় হবে!"

প্রধানমন্ত্রী জনা ত্রিশেক শ্রমিক পাঠালেন, কিন্তু তারা শীঘ্রই ফিরে এলেন, বললেন যে এই সাম্রাজ্যে অনেক বৃহৎ দেবদারু গাছ রয়েছে, তারা কখনই সেগুলিকে তুলে বা ছেঁচড়ে সেই কঠিন রাস্তাগুলি দিয়ে নিয়ে যেতে পারত না যা, শহর ও জঙ্গালের মাঝে অবস্থিত।

যখন রাজা এটি শুনলেন, তিতিটিতাংনর পুত্রকে ডাকলেন এবং বললেন, "তোমার সারথি নাও আর তোমার ঘোড়াগুলির সাহায্যে, আমাকে ওই গাছগুলির মধ্যে একটি এনে দাও"।

রাজপুত্র তার সারথির সঙ্গে যাত্রা করলেন ঠিক কিন্তু বেশ কিছুদিন বাদে ফিরে আসলেন, বললেন "কোনো ঘোড়া এমন গাছকে এক ইঞ্চিও নাড়াতে পারছে না। আমরা বলদেরও চেষ্টা করেছি, কিন্তু কোনো সফলতা মেলেনি"

"বেশ, তবে, হাতিদের দিয়ে চেষ্টা করো।" রাজা বললেন।

হাতিদের সমতল থেকে আনানো হয়, কিন্তু পাহাড়গুলি তাদের জন্য অত্যন্তই খাড়া এবং- রাস্তাগুলিও অতীব সংকীর্ণ; তাদের উপত্যকা থেকে ফেরত আসতে হবে।

"খুব ভালো" রাজন ক্রুদ্ধ ভাবে বললেন, "আমার দুটি উদ্যানের যে কোনো একটিতে তোমাকে অরণ্যের বড়ো গাছগুলির মতোই একটি গাছ আমাকে খুঁজে দিতে হবে। এটি সাত দিনের মধ্যেই আমাকে জোগাড় করে দাও।"

অনেক সন্ধানের পর, রাজনের লোকেরা একাটি জাঁকজমকপূর্ণ দেবদারু বৃক্ষ খুঁজে পেলেন যা নগরের খুব বেশি দূরে ছিল নয়। এটি চারিদিকের গ্রামগুলির মানুষদের দ্বারা পুজিত হত, কারণ এর মধ্যে এক দেবী বসবাস করতেন এবং এটি হলেন তিনি, যিনি বৃক্ষটিকে তার মহান শক্তিবল, আকৃতি এবং সৌন্দর্য প্রদান করেছে।

যখন প্রধানমন্ত্রী ও তার লোকজনেরা সিদ্ধান্ত নিলেন যে রাজার প্রাসাদের সেই স্তম্ভটি অবশ্যই এই সুউচ্চ দেবদারু বৃক্ষটির দ্বারা তৈরি হওয়া উচিত, তাঁরা মালা, প্রদীপ ও সঙ্গীতের আয়োজন করেছিলেন অন্দরের দেবীর প্রতি শ্রদ্ধা- জ্ঞাপন করতে এবং দেবীকে তাঁর আবাস ত্যাগ করার জন্য সতর্ক করতে।

তারা তাদের প্রদীপগুলি জ্বালালেন এবং সেগুলিকে গাছের চারিদিকে গোল করে সাজালেন। তাদের মালাগুলি তারা গাছের শাখায় ঝোলালেন এবং পুষ্পস্তবক পাতায় বাঁধলেন। তারপর হাতে হাত রেখে কিছুজন নাচল এবং বাকিরা গাইলঃ-

নিষ্ঠুর কুড়ল নিয়ে আমরা এসেছি
তোমার বহুকালের বাড়ি ভাঙতে;
আমাদের ক্ষমা করুন, মহান বৃক্ষ-
দেবী আমরা আপনার সিংহাসনের সামনে
নাচছি
রাজাকে খুশি করার জন্য আমাদের
আপনার সবচেয়ে প্রিয় গাছটি কেটে ফেলতে
হবে।

বৃক্ষ-দেবী শুনলেন, এবং বুঝতে পারলেন। কী ঘটতে চলেছে। সে কয়েক মুহূর্ত বিশ্রামের বাতাসের মতো নীরব রইলো এবং তারপরে তার সমস্ত পাতা ফিসফিস করতে শুরু করলো এবং তার উপরের শাখা গুলি নত হয়ে গেল। লোকগুলি এই ভেবে সন্তুষ্ট হয়ে চলে গেল যে সে শুনেছে এবং বুঝতে পেরেছে।

সেই রাতে, যখন রাজা ঘুমে আচ্ছন্ন ছিলেন, এক চকচকে সবুজ পাতায় আবৃত মহীমান্বিত মূর্তি তার সামনে আবির্ভূত হলেন, এবং শরতের পাতার কোলাহলের মত কন্ঠে বললেনঃ-

"আমি দেবদারু গাছের দেবী, মহান রাজা, আপনার লোকেরা আমায় বলেছে যে আপনি আমাকে কেটে ফেলতে চান। আমি আপনার মন পরিবর্তনের জন্য আপনাকে অনুরোধ করতে এসেছি।"

"না আমার মন স্থির হয়ে গেছে" রাজা স্বপ্নে উত্তর দিলেন। "আমার পুরো উদ্যানে আপনি একমাত্র গাছ যেটি নিজে একটি প্রাসাদকে ধরে রাখার মত যথেষ্ট শক্তিশালী এবং তাই আমার অবশ্যই এটিই লাগবে।"

"কিন্তু বিবেচনা করুন হে মহারাজ, শত শত বছর ধরে আপনার সাম্রাজ্যের সমস্ত গ্রামের লোকেরা আমার পুজো করে এসেছে এবং তারা আমার কাছ থেকে ভালো ছাড়া আর কিছুই চায় নি। পাখিরা আমার মধ্যে বাসা বাঁধে। আমি ঘাসের ওপর সবচেয়ে সুন্দর ছায়া প্রদান করি। লোকেরা আমার কাণ্ডের গায়ে বিশ্রাম নেয় এবং বন্যপ্রাণীরা আমার গায়ে নিজেদের ঘষে। পৃথিবী আমাকে আশীর্বাদ করে এবং আমার প্রতিরক্ষামূলক বাহুর অধীনে নতুন গাছপালা এবং তৃণ পাঠায়। আমি পৃথিবীকে আমার শক্ত শিকড়বাকর দ্বারা বেঁধে রাখি। শিশুরা আমার পায়ের পাতায় খেলা করে এবং মার থেকে ফিরে আসা মহিলারা আমার শীতলতায় আশ্রয় খোঁজে।"

"সবই সত্য, হে বৃক্ষ দেবী" রাজা বললেন, " কিন্তু আমি তোমাকে রেহাই দিতে পারি না। আমার মন তৈরি হয়ে গিয়েছে, আমার ইচ্ছার নড়চড় করা যায় না।"

বৃক্ষ দেবী তার বুকের কাছে মাথা নোয়ালেন এবং বড় দুঃখের সুরে বললেন:-

"তাহলে, পরাক্রমশালী রাজা আমার একটি শেষ অনুরোধ রাখুন। আমাকে তিন ভাগে বিভক্ত করা হোক। প্রথমে আমার মস্তক, তার সবুজের মুকুটের সাথে। তারপর আমার মধ্য অংশ তার শত শক্তিশালী বাহু ও হাতের সাথে এবং শেষে আমার ভিত্তি যা এটিতে আমার সর্বোচ্চ ভার এবং গাঁট বহন করে"

"এটি একটি অদ্ভুত অনুরোধ" রাজা বললেন, " আমি আগে কখনো এমন শুনিনি যে কেউ তিনবার মৃত্যুজনিত আঘাত ভোগ করতে চেয়েছিল। কেন আপনি এটি একেবারেই ভোগ করছেন না?"

"কারণটা স্পষ্ট" বৃক্ষ দেবী বললেন, " আমার থেকে কয়েক ডজন তরুণ দেবদারু গাছের উত্থান হয়েছে। এবং তারা আমার চারপাশে বেড়ে উঠেছে। আপনি যদি আমাকে একটি শক্তিশালী আঘাতে পতিত করেন, তবে আমার ওজন অবশ্যই আমার সমস্ত সন্তানকে পিষে মেরে ফেলবে। কিন্তু আমি যদি তিনবার আঘাত সহ্য করি এবং তিন টুকরো হয়ে পতিত হই তবে অল্পবয়সী কেউ কেউ পালিয়ে বেঁচে যেতে পারবে। আমার প্রার্থনা কি মঞ্জুর হবে?"

"বেশ তাই হবে" বিস্মিত রাজা বললেন, বৃক্ষ দেবী তাঁর দৃষ্টি থেকে বিবর্ণ হয়ে গেলেন।

পরের দিন সকালে রাজা তার সন্তানদের এবং তার মন্ত্রীদের এবং তার বন কর্মীদের তার কাছে ডেকে পাঠালেন এবং তাদের বললেন যে তিনি তার মন পরিবর্তন করেছেন এবং নতুন প্রাসাদের স্তম্ভটি কাঠের নয় এবং পাথর দিয়ে করা উচিত ।

" কারণ" তিনি বললেন "দেবদারু গাছের মধ্যে আমার নিজের চেয়েও মহৎ আত্মা বাস করে" এবং তিনি তাদের তার দর্শনের কথা বললেন এবং তারা সবাই আশ্চর্য হয়ে গেল।

এবং রাজা তার প্রাসাদটি একটি বড় পাথরের স্তম্ভের উপর নির্মাণ করেছিলেন এবং এর ভিত্তির চারপাশে তিনি একটি সুন্দর উদ্যান নির্মাণ করেছিলেন এবং শহর ও আশেপাশে গ্রামের শিশুরা ঘাসের উপর বসে অনেক সুন্দর ফুল ও গাছ উপভোগ করতে উদ্যানে চারদিকে লাগানো হয়েছিল।

রাজার উদাহরণ নিয়ে, কেউ আর নিজের বাড়ি কাঠের তৈরি করেনি। বাড়িগুলোকে পাথর দিয়ে তৈরি করা হয়েছিল এবং মহান দেবদারু গাছেরা বনের মধ্যে অবাধে ছড়িয়ে পড়তে সক্ষম হয়েছিল।

"এবং তুমি যদি ওই পাহাড়ে যাও" ঠাকুমা বললেন, "তুমি এখনো সেই বোনগুলি দেখতে পাবে, পবিত্র নদী গঙ্গার চারিপাশে অনন্ত তুষারপাতের কাছে তার উৎস পর্যন্ত"

এছাড়াও অনুবাদ করেছে -

- **অদ্রীকা নন্দী (ষষ্ঠ শ্রেণি)**
- **অস্মিতা সেন (ষষ্ঠ শ্রেণি)**

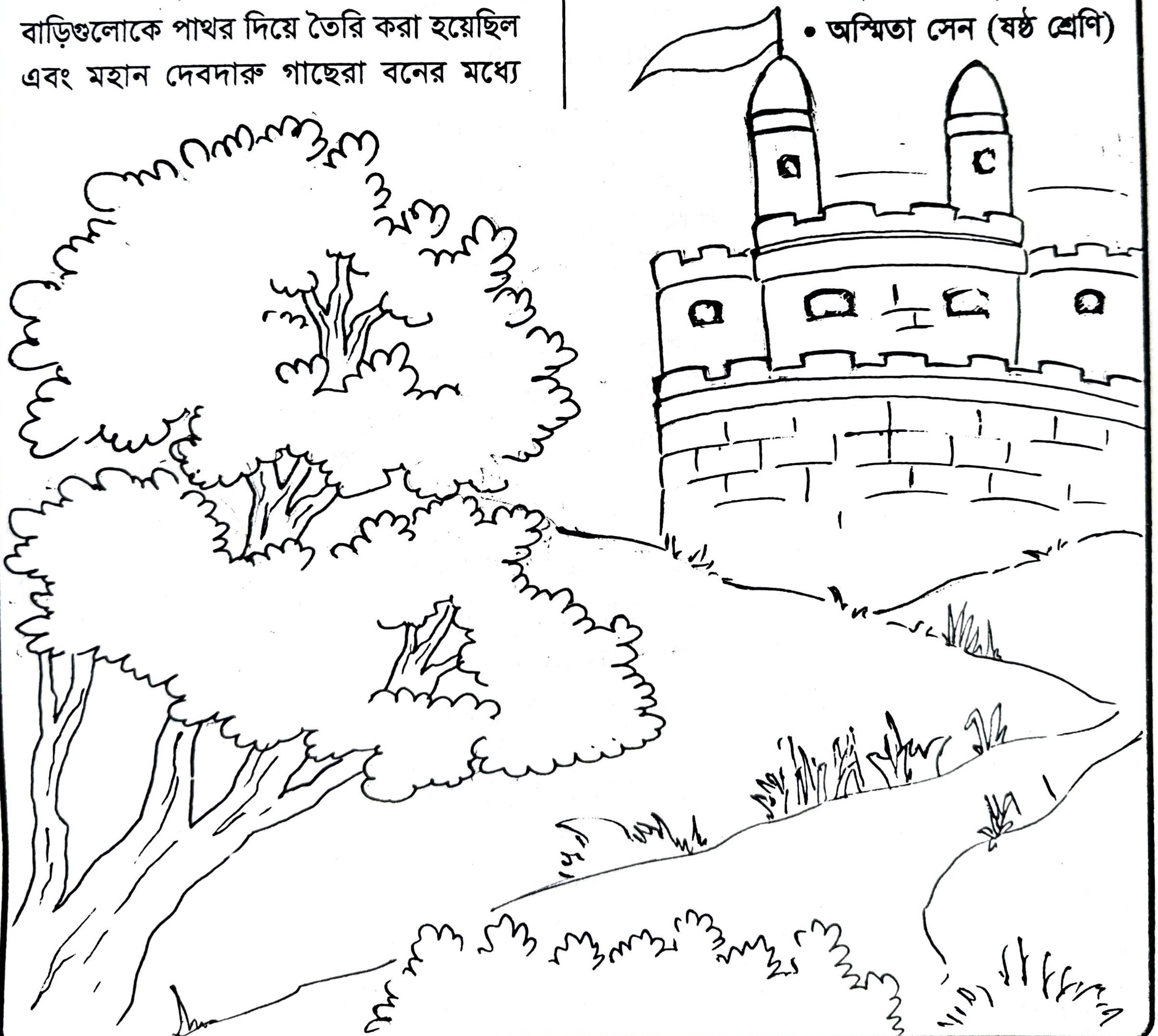

নতুন সমাজ গড়বো

সুনীল সাহা, সংগঠক শিক্ষক

উৎসবে মোরা ব্যস্ত সবাই
করছি হৈ-চৈ,
ঘরে ফিরে দেখি আমার
ছোট্ট বোনটি কৈ?

ঘরের সামনে ভিড় জমেছে
সবাই চুপ-চাপ,
জ্ঞানহারা মা ঘরের কোনে
চাতালে বৃদ্ধ বাপ!

জনে জনে শুধোয় আমি
বোনটি আমার কোথা?
থমথমে মুখ, জলে ভরা চোখ,
নিচু সবার মাথা।

আগুন চোখে বৃদ্ধা খুরি
চেঁচিয়ে উঠে বলে,
দানবেরা জোর করে-
নিয়ে গেছে চলে।

কোথায় গেছে কোন দিকে
বলো আমায় খুরি,
কোন দানবেরা ছোট্ট বোনের
ইজ্জত করলো চুরি।

তালতলার ঐ পুকুরে তোর
বোনের দেহ ভাসে,
ক্ষত-বিক্ষত দেহ তার
দানবের সর্বনাশে।

(২)

মুহূর্তে আমি ছুটে যাই
ঐ পুকুর পাড়ে,
আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা সব
দাঁড়িয়ে সারে সারে।

সবার চোখে জল শুধু,
করছে হায় হায়,
মা-বোন নিয়ে মোদের কী
বাঁচার নেই উপায়।

বৃদ্ধা খুরি চেঁচিয়ে বলে
অনেক করেছি সহ্য,
অত্যাচারের পাহাড়ে মোদের
ভেঙেছে এবার ধৈর্য্য।

এবার সবাই গর্জে ওঠো,
দানবেরা যাক্ দূরে-
মহা-বিপ্লব গড়ে তোলো
কণ্ঠ মেলাও সুরে।

বিচার মোরা পাবো নাকো-
বিচার মোরা করবো,
সবাই মিলে সামিল হয়ে
নতুন সমাজ গড়বো।

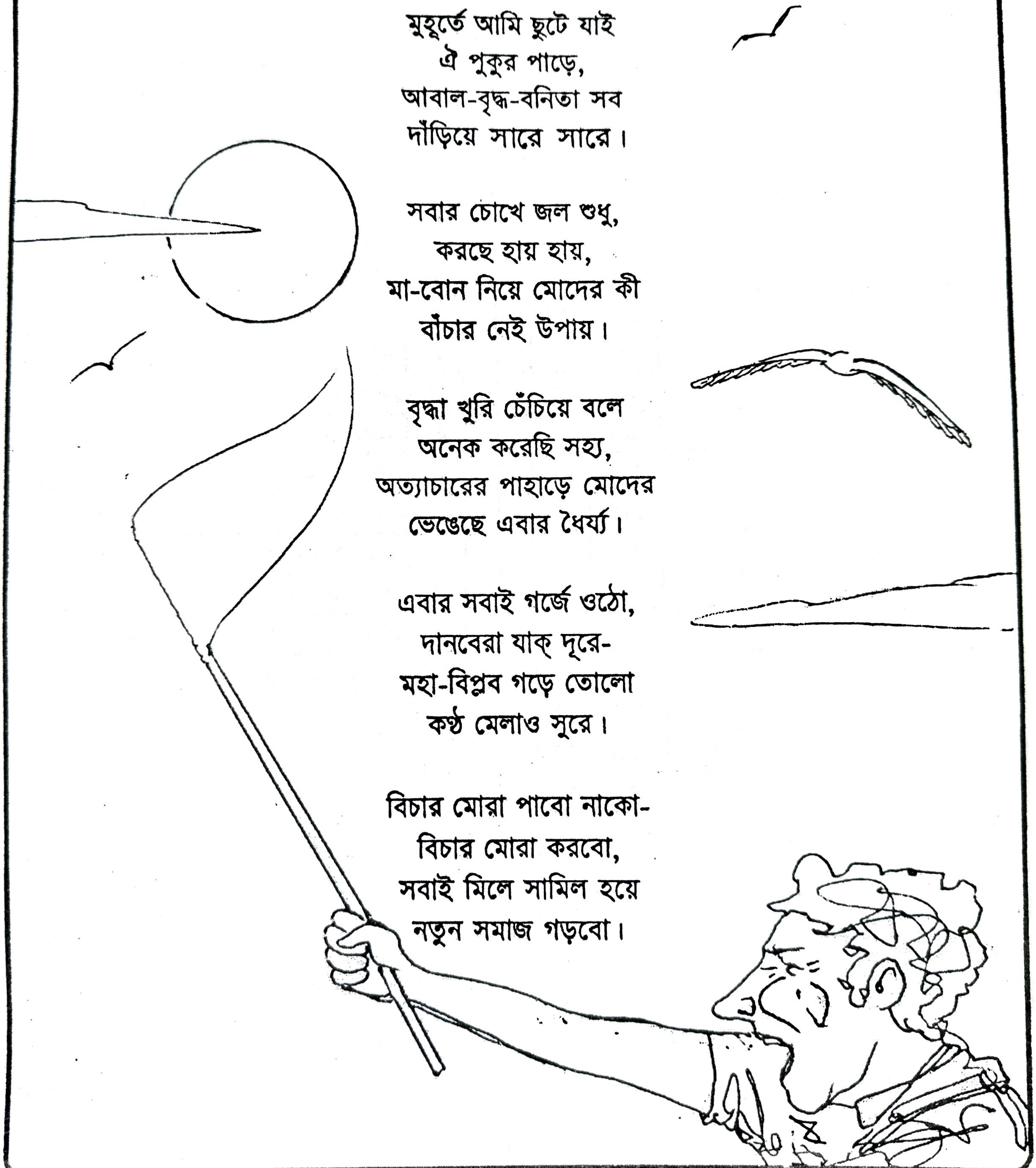

মাধ্যমিক পরীক্ষার ফলাফল - ২০২৫

Sl.No	Student Name	Marks	Rank
1	SAHNIK SINHA ROY	669	1
2	ARITRA MUKHERJEE	666	2
3	GANESH BISWAS	665	3
4	SUBHRADEEP HOWLADER	661	4
5	AKASH DEY	658	5
6	UTTSAB DE	656	6
7	SOUVIK SEAL	653	7
8	KINGSUK DAS	652	8
9	ANURUP CHOWDHURY	648	9
10	SRIPARNA MITRA	647	10
11	KRISHNENDU GANDHIK	643	11
12	SOUMI SADHAK	641	12
13	ADRIJA JANA	639	13
14	SHUVADIP PAL	638	14
15	ANWESHA PAL	636	15
16	DITI DEBNATH	635	16
17	TISTA CHATTERJEE	634	17
18	SNEHA HORE	628	18
19	UDITA SARKER	624	19
20	RUDRANIL DAS	624	19
21	IMON CHATTERJEE	623	20
22	ASMITA SEN	622	21
23	PARTHAJIT SAHA	622	21
24	BITASTA MAITY	621	22
25	ANIK NEOGI	620	23
26	SAMMELAN DAS	620	23
27	SURABHI BANERJEE	616	24
28	PRASUN GHOSH	614	25
29	AHANA SAHA	612	26
30	SHRADDHANJALI KARMAKAR	612	26

Sl.No	Student Name	Marks	Rank
31	TANUSHREE ROY	610	27
32	SHUBHADEEP MONDAL	610	27
33	ADITI ROY	608	28
34	SHREEJITA DAS	607	29
35	RUPSHA SARKAR	606	30
36	BARSHA GOPE	602	31
37	IPSHITA NAG	601	32
38	ARNAB MITRA	601	32
39	MAYUKH DAS	600	33
40	MOHONA BISWAS	598	34
41	DEBBARNA MISTRY	595	35
42	SRIJAN DUTTAGUPTA	590	36
43	ANANYA BOSE	585	37
44	BIDIPTA DAS	584	38
45	PRONITA DAS	580	39
46	SOUMYODIP BANERJEE	579	40
47	NANDITA TIKADAR	575	41
48	ANKITA SARKAR	569	42
49	MOUMITA BARAI	568	43
50	DRIK MONDAL	568	43
51	SHRESTHA MAJUMDER	566	44
52	ANWESHA SAHA	564	45
53	SHYAMASHREE CHAKRABORTY	563	46
54	SAMRIDDHI MUKHERJEE	561	47
55	SHREYASI GOLDAR	560	48
56	SOUDIP BISWAS	559	49
57	SRIJIB PAL	559	49
58	RIYANKA DAS	558	50
59	AVISHIKTA CHAKRABORTY	554	51
60	ARIT SAHA	552	52

Sl.No	Student Name	Marks	Rank
61	ARSHIYA BHATTACHERJEE	546	53
62	RUPAM MANDAL	544	54
63	SWARNENDU PAL	543	55
64	AHANA GHOSH	542	56
65	SUBHAM THAKUR	541	57
66	AYUSH DEB	540	58
67	SAMADRITA MUNSHI	538	59
68	SUBHASREE SARKAR	536	60
69	ALOK DEY	535	61
70	TANIA ADHIKARY	530	62
71	MISHUK MONDAL	530	62
72	DEBADRITA ROY	530	62
73	RITOVAAS SARKAR	528	63
74	RAHUL CHOWDHURY	528	63
75	RUPAM KUNDU	524	64
76	SUBHRADEEP DAS	522	65
77	SUBHAM DUTTA	520	66
78	RITAM PODDER	519	67
79	AHONA DEB	518	68
80	JAGRITI NEOGI	518	68
81	AISHI ROY	517	69
82	ANWESHA BISWAS	516	70
83	ROCKY MONDAL	514	71
84	HAIMASREE GHOSH	510	72
85	KUHELIKA DAS	508	73
86	DEBANGAN KUNDU	508	73
87	ABIR BISWAS	506	74
88	AISHI KHAN	500	75
89	ARIJIT BISWAS	499	76
90	PALASH KARMAKAR	498	77

Sl.No	Student Name	Marks	Rank
91	PRERONA MALLICK	495	78
92	RUPSA GOPE	490	79
93	ADRIJA DUTTA	485	80
94	ANKITA SAHA	483	81
95	RUPSA DAS	483	81
96	POULAMI GHOSH	480	82
97	SURYA BANERJEE	479	83
98	TUHIN ROY	477	84
99	SRINJOY GHOSH	472	85
100	SAPTAPARNA PATRA	471	86
101	SAMPRITI SEN	471	86
102	SRIJAN GHOSH	466	87
103	AMBAR ACHARYA	463	89
104	DEBPARNA MALLICK	456	90
105	PRIYANJANA DAS	445	91
106	SUMIT DEBNATH	445	91
107	PRATYUSA BARDHAN	444	92
108	SNEHASHIS MANDAL	444	92
109	ISHIKA HAZRA	443	93
110	DIPON BASAK	439	94
111	RAJDIP DEBNATH	439	94
112	SARBAJAYA ACHARJEE	439	94
113	SAYAK ACHARJEE	436	95
114	ROHIT GHOSH	434	96
115	ADITYA DHAR	434	96
116	ISHANI MONDAL	431	97
117	ARITRA BISWAS	430	98
118	SANCHITA GOSWAMI	429	99
119	SOUMI SEN	426	100
120	SAMADARSHI DEY	425	101

Sl.No	Student Name	Marks	Rank
121	DEBOJIT SAHA	425	101
122	SOUNAK DAS	418	102
123	SAYANTIKA BISWAS	417	103
124	ROSHNI SEN	416	104
125	DIPAMRITA CHAKRABORTY	415	105
126	PAPRI BISWAS	415	105
127	SAGNIK DEY	413	106
128	SAGNIK MUKHERJEE	409	107
129	DEBANKUR DAS	408	108
130	PRIYOM MANDAL	405	109
131	ANIRUDDHA CHOWDHURY	402	110
132	PRALAY HALDER	400	111
133	SAGNIK DEY	397	112
134	MEGHA SARKAR	391	113
135	JOY HOWLADER	391	113
136	SHUVAM PAUL	391	113
137	SWASTIKA KARMAKAR	390	114
138	SURUDRA BHAKTA	388	115
139	ARITRO DAS	383	116
140	ABHRADEEP PAUL	382	117
141	CHANDRA BANERJEE	382	117
142	PREYOSHI PAUL	373	118
143	SWYAM SARKAR	373	118
144	SUPRITI DAS	371	119
145	TANMOY SAHA	369	120
146	ANIK SARKAR	368	121
147	SUBHRAJIT DEBNATH	368	121
148	PIYALI DAS	366	122
149	SOBUJ DEY	360	123
150	TAMOJIT BANERJEE	360	123

Sl.No	Student Name	Marks	Rank
151	ADRITO GHOSH	356	124
152	SAYAN DUTTA	353	125
153	SAINI GOLDER	350	126
154	RIMITA MONDAL	349	127
155	MANISHA DEY	347	128
156	MALA MUKHERJEE	342	129
157	SRIJAN KUMAR NATH	335	130
158	SOUMILI MONDAL	334	131
159	RITABROTA DUTTA GUPTA	325	132
160	SOUMYADIP BISWAS	317	133
161	SAYANTAN ACHARJEE	316	134
162	SOUVIK GHOSH	310	135
163	KAUSHIK GHOSH	310	135
164	SOMASHREE MUKHERJEE	306	136
165	RAKTIMA SADHAK	300	137
166	PRERONA SARKAR	298	138
167	SURJO MONDAL	291	139
168	ROHIT BASAK	279	140
169	RUPSA MAJUMDER	277	141
170	TRISHA CHOWDHURY	273	142
171	SHIBAM PAUL	255	143
172	TANIA MADHU	252	144
173	AVIJIT GHOSH	247	145
174	MOHONA SAMADDAR	245	146
175	ANWESHA PAUL	220	147
176	ARGHADEEP DEY	201	148

উচ্চ-মাধ্যমিক পরীক্ষার ফলাফল - ২০২৫

Sl.No	Student Name	Marks	Rank
1	DEBOJYOTI CHATTERJEE	484	1
2	AISHI DEY	469	2
3	AYANA SARKAR	464	3
4	DEBARNA MAJUMDER	460	4
5	RAJANYA BISWAS	457	5
6	SOLANKI KARMAKAR	455	6
7	RITTIKA PAUL	447	7
8	ANKANA DAS	446	8
9	SAMPURNA SARKAR	443	9
10	ANINDITA DAS	435	10
11	ANUSKA PAUL	430	11
12	JYOTISHKA DAS	430	11
13	MADHULIKA KANJI	426	12
14	SUMANA PANDIT	419	13
15	SRIJA ROY	419	13
16	ARCHITA DAS	417	14
17	SWASTIKA DEB	411	15
18	SNEHA PAUL	407	16
19	BARSHA DUTTA	407	16
20	SRIJEETA CHAKRABORTY	404	17
21	DRISHA PAUL	400	18
22	DIVIYA MONDAL	398	19

Sl.No	Student Name	Marks	Rank
23	SUJOY SHOM	391	20
24	TARUPARNA CHATTOPADHYAY	388	21
25	SHREYASHI SAHA	385	22
26	DEBARPAN HALDER	385	22
27	ROHIT DAS	384	23
28	DEBAROTI BANERJEE	384	23
29	ARKA SARKAR	375	24
30	RAJ BARAI	370	25
31	ABHIRUP GHOSH	369	26
32	PRITHA BHATTACHARYA	367	27
33	RUCHITA KARMAKAR	363	28
34	MEGHNA MALLICK	361	29
35	RIDDHIKA BANERJEE	360	30
36	SAGNIK GHOSH	356	31
37	ARUNABHA DE	350	32
38	SOURANSHU SENGUPTA	350	32
39	NILABRATA BISWAS	344	33
40	SAYANTAN DAS	342	34
41	ARKADEEP ROY CHOUDHURY	324	35
42	RISHAV NANDY	313	36
43	BITI SAHA	312	37
44	TRISHA ROY	234	38

AidCanopy
Healing the Ailing World

RQG

An AID Canopy Foundation & B.R.V. Initiative
Presented by RQG

DHIMAN CHAKRABORTY MEMORIAL CHAMPIONSHIP

ALL BENGAL SCHOOL QUIZ 2K25

Date: 17th AUGUST (SUNDAY) **Time:** 10.00 A.M.

Address: BEDIBHAWAN RABITIRTHA VIDYALAYA (H.S.), KALYANI, NADIA

- CLASS VII-XII STUDENTS
- CROSS-SCHOOL TEAM NOT ALLOWED
- TEAM OF 2 OR FEWER
- 4 TEAMS PER SCHOOL

Grand Prize Pool, 1 Lakh!!
1st: INR 20000
2nd: INR 15000
3rd: INR 10000

- Cash prize for all finalists
- School Trophy, Individual Trophy
- Encouragement Prizes for 25 more Teams

BEDIBHAWAN RABITIRTHA VIDYALAYA (H.S.)

BEDIBHAWAN, KALYANI,
NADIA, 741250

CONGRATULATIONS

TO ALL OF CLASS XII (2024-25)

FOR COMMENDABLE PERFORMANCE IN HIGHER SECODARY EXAMINATION- 2025 OF WEST BENGAL

Total Candidate (Enrolled)	44
Total Candidate (Appeared)	44
Plucked	NIL
Passed	44
Passed (%)	100%
Highest Marks Obtained	484

Above 90% + Marks	06
Above 80% + Marks	21
Above 60% + Marks	43
Above 45% + Marks	44
Above 35% + Marks	44
Above 25% + Marks	44

DEBAJYOTI CHATERJEE
484
RANK 14TH
IN WEST BENGAL

AISHI DEY
469

AYANA SARKAR
464

DEBARNA MAJUMDER
460

RAJANYA BISWAS
457

SOLANKI KARMAKAR
455

RITTIKA PAUL
447

ANKANA DAS
446

SAMPURNA SARKAR
443

ANINDITA DAS
435

Heartiest Congratulation to all the Students & the Teachers for the excellent achievements

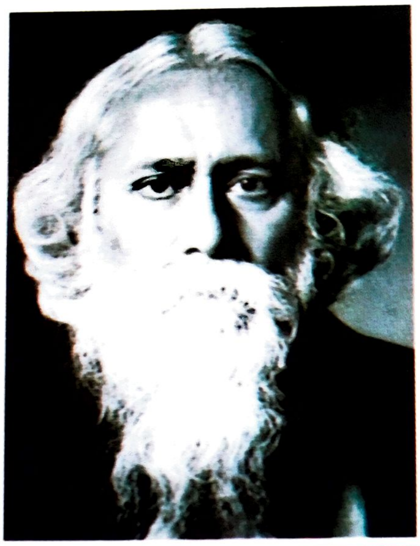

চিত্ত যেথা ভয়শূন্য, উচ্চ যেথা শির,
জ্ঞান যেথা মুক্ত, যেথা গৃহের প্রাচীর
আপন প্রাঙ্গণতলে দিবসশর্বরী
বসুধারে রাখে নাই খণ্ড ক্ষুদ্র করি,
যেথা বাক্য হৃদয়ের উৎসমুখ হতে
উচ্ছ্বসিয়া উঠে, যেথা নির্বারিত স্রোতে
দেশে দেশে দিশে দিশে কর্মধারা ধায়
অজস্র সহস্রবিধ চরিতার্থতায়-
যেথা তুচ্ছ আচারের মরুবালুরাশি
বিচারের স্রোতঃপথ ফেলে নাই গ্রাসি,
পৌরুষেরে করেনি শতধা; নিত্য যেথা
তুমি সর্ব কর্ম চিন্তা আনন্দের নেতা-
নিজ হস্তে নির্দয় আঘাত করি, পিতঃ,
ভারতেরে সেই স্বর্গে করো জাগরিত।

কেবল জ্ঞানের শিক্ষা নয়
বোধের শিক্ষাকে আমাদের
বিদ্যালয়ে প্রধান স্থান দিতে হবে ।

প্রকাশনা ঃ বেদীভবন রবিতীর্থ
বেদীভবন, কল্যাণী, নদীয়া ।
মুদ্রণ ঃ বর্ণালী প্রিন্টার্স, বেদীভবন বাজার, কল্যাণী, নদীয়া।